ভয়

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

চোখ 2
চোখ (১ম অংশ) 2
চোখ (২য় অংশ) 16
চোখ (৩য় অংশ) 20
জিন- কফিল 27
সঙ্গিনী (গল্প) 108

চোখ

চোখ (১ম অংশ)

ভোর ছটায় কেউ কলিং বেল টিপতে থাকলে মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। মিসির আলির মেজাজ তেমন বিগড়াল না। সকাল দশটা পর্যন্ত কেন জানি তাঁর মেজাজ বেশ ভালো থাকে। দশটা থেকে খারাপ হতে থাকে, চূড়ান্ত রকমের খারাপ হয় দুটার দিকে। তারপর আবার ভালো হতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে অসম্ভব ভালো থাকে। তারপর আবার খারাপ হতে শুরু করে। ব্যাপারটা শুধু তাঁর বেলায় ঘটে না সবার বেলায়ই ঘটে তা তিনি জানেন না। প্রায়ই ভাবেন একে ওকে জিজ্ঞেস করবেন—শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। তাঁর চরিত্রের বড় রকমের দুর্বল দিক হচ্ছে পরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না। অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারেন, কথা বলতে ভালোও লাগে। সেদিন রিকশা করে আসতে রিকশাওয়ালার সঙ্গে অতি উচ্চ শ্রেণীর কিছু কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন। রিকশাওয়ালার বক্তব্য হচ্ছে—পৃথিবীতে যত অশান্তি সবের মূলে আছে মেয়েছেলে।

মিসির আলি বললেন, এই রকম মনে হওয়ার কারণ কী?

রিকশাওয়ালা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল, চাচামিয়া, এই দেহেন আমারে। আইজ আমি রিকশা চালাই। এর কারণ কী? এর কারণ বিবি হাওয়া। বিবি হাওয়া যদি কুবুদ্ধি দিয়া বাবা আদমরে গন্ধম ফল না খাওয়াইতো, তা হইলে আইজ আমি থাকতাম বেহেশতে। বেহেশত তো আর রিকশা চালানির কোনো বিষয় নাই, কী কন চাচামিয়া? গন্ধম ফল খাওয়ানির কারণেই তো আইজ আমি দুনিয়ায় আইসা পড়লাম।

মিসির আলি রিকশাওয়ালার কথাবার্তায় চমৎকৃত হলেন। পরবর্তী দশ মিনিট তিনি রিকশাওয়ালাকে যা বললেন, তার মূল কথা হলো—নারীর কারণে আমরা যদি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকি তাহলে নারীই পারে আবার আমাদের স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। রিকশাওয়ালা কী বুঝল কে জানে। তার শেষ বক্তব্য ছিল—যা-ই কন চাচামিয়া, মেয়ে মানুষ আসলে সুবিধার জিনিস না।

কলিং বেল আবার বাজছে।

মিসির আলি বেল টেপার ধরন থেকে অনুমান করতে চেষ্টা করলেন—কে হতে পারে। ভিখিরি হবে না। ভিখিরিরা এত ভোরে বের হয় না। ভিক্ষাবৃত্তি যাদের পেশা তারা পরিশ্রান্ত হয়ে গভীর রাতে ঘুমুতে যায়, ঘুম ভাঙতে সেই কারণেই দেরি হয়। পরিচিত কেউ হবে না। পরিচিতরা এত ভোরে আসবে না। তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে পারে এমন ঘনিষ্ঠতা তাঁর কারো সঙ্গেই নেই।

যে এসেছে, সে অপরিচিত। অবশ্যই মহিলা। পুরুষরা কলিং বেলের বোতাম অনেকক্ষণ চেপে ধরে থাকে। মেয়েরা তা পারে না। মেয়েটির বয়স অল্প তাও অনুমান করা যাচ্ছে। অল্পবয়স্ক মেয়েদের মধ্যে একধরনের ছটফটে ভাব থাকে। তারা অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার বেল টিপবে। নিজেদের অস্থিরতা ছড়িয়ে দেবে কলিং বেলে।

মিসির আলি, পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে দরজা খুললেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁর অনুমান সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে—মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বেঁটেখাটো একজন মানুষ। গায়ে সাফারি। চোখে সানগ্লাস। এত ভোরে কেউ সানগ্লাস পরে না। এই লোকটি কেন পরেছে কে জানে।

'স্যার স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আপনার নাম কি মিসির আলি?'

‘জি।’

‘আমি কি আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি?’

মিসির আলি কী বলবেন মনস্থির করতে পারলেন না। লোকটিকে তিনি পছন্দ করছেন না, তবে তার মধ্যে একধরনের আত্মবিশ্বাস লক্ষ করছেন, যা তাঁর ভালো লাগছে। আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা আজকাল আর দেখাই যায় না।

লোকটি শান্ত গলায় বলল, আমি আপনার কিছুটা সময় নষ্ট করব ঠিকই, তবে তার জন্যে আমি পে করব।

‘পে করবেন?’

‘জি। প্রতি ঘণ্টায় আমি আপনাকে এক হাজার করে টাকা দেব। আশা করি আপনি আপত্তি করবেন না। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?’

‘আসুন।’

লোকটি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, মনে হচ্ছে আপনার এখনো হাত-মুখ ধোয়া হয়নি। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, আমি অপেক্ষা করছি।

মিসির আলি বললেন, ঘণ্টা হিসাবে আপনি যে আমাকে টাকা দেবেন—সেই হিসাব কি এখন থেকে শুরু হবে? নাকি হাত-মুখ ধুয়ে আপনার সামনে বসার পর থেকে শুরু হবে?

লোকটি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, টাকার কথায় আপনি কি রাগ করেছেন?

‘রাগ করিনি। মজা পেয়েছি। চা খাবেন?’

‘খেতে পারি। দুধ ছাড়া।’

মিসির আলি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, এক কাজ করুন—রান্নাঘরে চলে যান। কেতলি বসিয়ে দিন। দুকাপ বানান। আমাকেও এক কাপ দেবেন।

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আমাকে ঘণ্টা হিসেবে পে করবেন বলে যেভাবে হকচকিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও ঠিক একইভাবে আপনাকে হকচকিয়ে দিলাম। বসুন, চা বানাতে হবে না। সাতটার সময় রাস্তার ওপাশের রেস্টুরেন্ট থেকে আমার জন্যে চা-নাশতা আসে। তখন আপনার জন্যেও চা আনিয়ে দেব।

‘থ্যাংক ইউ স্যার।’

‘আপনি কথা বলার সময় বারবার বাঁ দিকে ঘুরছেন, আমার মনে হচ্ছে আপনার বাঁ চোখটা নষ্ট। এই জন্যেই কি কালো চশমা পরে আছেন?’

ভদ্রলোক সহজ গলায় বললেন, জি। আমার বাঁ চোখটা পাথরের।

ভদ্রলোক সোফার এক কোণে বসলেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, লোকটি শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছে। চাকরির ইন্ট্যারভ্যু দিতে এলে ক্যানডিডেটরা যে ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে অবিকল সেই ভঙ্গি। মিসির আলি বললেন, আজকের খবরের কাগজ এখনো আসেনি। গত দিনের কাগজ দিতে পারি। যদি আপনি চোখ বুলাতে চান।

‘আমি খবরের কাগজ পড়ি না। একা একা বসে থেকে আমার অভ্যাস আছে। আমার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। শুরুতে টাকা দেয়ার কথা বলে যদি আপনাকে আহত করে থাকি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’

মিসির আলি টুথব্রাশ হাতে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। লোকটিকে তার বেশ ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। তবে কোন গুরুতর সমস্যা নিয়ে এসেছে বলে মনে হয় না। আজকাল অকারণেই কিছু লোকজন এসে তাঁকে বিরক্ত করা শুরু করেছে। মাসখানিক আগে একজন এসেছিল ভূতবিশারদ। সে নাকি গবেষণাধর্মী একটি বই লিখছে, যার নাম ‘বাংলার ভূত’। এ দেশে যত ধরনের ভূত-পেত্নী আছে সবার নাম, আচার-ব্যবহার বই-এ লেখা। মেছো ভূত, গেছো ভূত, জলা ভূত, শাকচুন্নি, কন্ধকাটা, কুনী ভূত, আঁধি ভূত...। সর্বমোট এক শ ছয় রকমের ভূত।

মিসির আলি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ভাই আমার কাছে কেন? আমি সারা জীবন ভূত নেই এইটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি...।

সেই লোক মহা উৎসাহী হয়ে বলল, কোন্ কোন্ ভূত নেই বলে প্রমাণ করেছেন—এইটা কাইন্ডলি বলুন। আমার কাছে ক্যাসেট প্লেয়ার আছে। আমি টেপ করে নেব।

সানগ্লাস পরা বেঁটে ভদ্রলোক সেই পদের কেউ কিনা কে বলবে?

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মিসির আলি বললেন, ভাই, বলুন কী ব্যাপার?

'প্রথমেই আমার নাম বলি—এখনো আমি আপনাকে আমার নাম বলিনি। আমার নাম রাশেদুল করিম। আমেরিকার টেঙ্াস এমঅ্যান্ডএন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের আমি একজন অধ্যাপক। বর্তমানে এক বছরের স্যাবোটিক্যাল লিভে দেশে এসেছি। আপনার খোঁজ কিভাবে এবং কার কাছে পেয়েছি তা কি বলব?'

'তার দরকার নেই। কি জন্যে আমার খোঁজ করছেন সেটা বলুন।'

'আমি কি ধূমপান করতে পারি? সিগারেট খেতে খেতে কথা বললে আমার জন্যে সুবিধা হবে। সিগারেটের ধোঁয়া একধরনের আড়াল সৃষ্টি করে।'

'আপনি সিগারেট খেতে পারেন, কোন অসুবিধা নেই।'

'ছাই কোথায় ফেলব? আমি কোন এসট্রে দেখতে পাচ্ছি না।'

'মেঝেতে ফেলুন। আমার গোটা বাড়িটাই একটা এসট্রে।'

রাশেদুল করিম সিগারেট ধরিয়েই কথা বলা শুরু করলেন। তাঁর গলার স্বর ভারী এবং স্পষ্ট কথাবার্তা খুব গোছানো। কথা শুনে মনে হয় তিনি কী বললেন তা আগেভাগেই জানেন। কোন্ বাক্যটির পর কোন্ বাক্য বলবেন তাও ঠিক করা। যেন ক্লাসের বক্তৃতা। আগে থেকে ঠিকঠাক করা। প্রবাসী বাঙালিরা একনাগাড়ে বাংলায় কথা বলতে পারেন না—ইনি তা পারছেন।

'আমার বয়স এই নভেম্বরে পঞ্চাশ হবে। সম্ভবত আমাকে দেখে তা বুঝতে পারছেন না। আমার মাথার চুল সব সাদা। কলপ ব্যবহার করছি গত চার বছর থেকে। আমার স্বাস্থ্য ভালো। নিয়মিত ব্যায়াম করি। মুখের চামড়ায় এখনো ভাঁজ পড়েনি। বয়সজনিত অসুখ-বিসুখ কোনটাই আমার নেই। আমার ধারণা শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে আমার কর্মক্ষমতা এখনো একজন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবকের মতো। এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। আজ আমার গায়েহলুদ। মেয়ে পক্ষীয়রা সকাল নয়টায় আসবে। আমি ঠিক আটটায় এখান থেকে যাব। আটটা পর্যন্ত সময় কি আমাকে দেবেন?'

'দেব। ভালো কথা, এটা নিশ্চয়ই আপনার প্রথম বিবাহ না। এর আগেও আপনি বিয়ে করেছেন?'

'জি। এর আগে একবার বিয়ে করেছি। এটি আমার দ্বিতীয় বিবাহ। আমি আগেও বিয়ে করেছি তা কী করে বললেন?'

'আজ আপনার গায়েহলুদ তা খুব সহজভাবে বললেন দেখে অনুমান করলাম। বিয়ের তীব্র উত্তেজনা আপনার মধ্যে দেখতে পাইনি।'

'সব মানুষ তো একরকম নয়। একেকজন একেক রকম। উত্তেজনার ব্যাপারটি আমার মধ্যে একেবারেই নেই। প্রথমবার যখন বিয়ে করি তখনো আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা ছিল না। সেদিনও আমি যথারীতি ক্লাসে গিয়েছি। গ্রুপ থিওরির ওপর এক ঘণ্টার লেকচার দিয়েছি।'

'ঠিক আছে, আপনি বলে যান।'

রাশেদুল করিম শান্ত গলায় বললেন, আপনার ভেতর একটা প্রবণতা লক্ষ করছি—আমাকে আর দশটা মানুষের দলে ফেলে বিচার করার চেষ্টা করছেন। দয়া করে তা করবেন না। আমি আর দশজনের মতো নই।

'আপনি শুরু করুন।'

'অঙ্কশাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি নিয়ে আমি আমেরিকা যাই পিএইচডি করতে। এমএ-তে আমার রেজাল্ট ভালো ছিল না। টেনেটুনে সেকেন্ড ক্লাস। প্রাইভেট কলেজে কলেজে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন বন্ধুদের দেখাদেখি জি-আর-ই পরীক্ষা দিয়ে ফেললাম। জি-আর-ই পরীক্ষা কী তা কি আপনি জনেন? গ্রাজুয়েট রেকর্ড একজামিনেশন। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে হলে এই পরীক্ষা দিতে হয়।'

'আমি জানি।'

'এই পরীক্ষায় আমি আশাতীত ভালো করে ফেললাম। আমেরিকান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে আমন্ত্রণ চলে এল। চলে গেলাম। পিএইচডি করলাম প্রফেসর হোবলের সঙ্গে। আমার পিএইচডি ছিল গ্রুপ থিওরির একটি শাখায়—নন অ্যাবেলিয়ান ফাংশানের ওপর। পিএইচডির কাজ এতই ভালো হলো যে আমি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম। অঙ্ক নিয়ে বর্তমান কালে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁরা সবাই আমার নাম জানেন। অঙ্কশাস্ত্রের একটি ফাংশান আছে যা আমার নামে পরিচিত। আর কে এঙ্গোপানেনশিয়াল। আর কে হচ্ছে রাশেদুল করিম।

পিএইচডির পরপরই আমি মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেলাম। সেই বছরই বিয়ে করলাম। মেয়েটি মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টসের ছাত্রী—স্প্যানিশ আমেরিকান। নাম জুডি বারনার।

'প্রেমের বিয়ে?'

'প্রেমের বিয়ে বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। বাছাবাছির বিয়ে বলতে পারেন। জুডি অনেক বাছাবাছির পর আমাকে পছন্দ করল।'

'আপনাকে পছন্দ করার কারণ কী?'

'আমি ঠিক অপছন্দ করার মতো মানুষ সেই সময় ছিলাম না। আমার একটি চোখ পাথরের ছিল না। চেহারা তেমন ভালো না হলেও দুটি সুন্দর চোখ ছিল। আমার মা বলতেন,

রাশেদের চোখে জন্ম-কাজল পরানো। সুন্দর চোখের ব্যাপারটা অবশ্য ধর্তব্য নয়। আমেরিকান তরুণীরা প্রেমিকদের সুন্দর চোখ নিয়ে মাথা ঘামায় না—তারা দেখে প্রেমিক কী পরিমাণ টাকা করেছে এবং ভবিষ্যতে কী পরিমাণ টাকা সে করতে পারবে। সেই দিক দিয়ে আমি মোটামুটি আদর্শ স্থানীয় বলা চলে। ত্রিশ বছর বয়সে একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি পজিশন পেয়ে গেছি। ট্যানিউর পেতেও কোনো সমস্যা হবে না। জুডি স্বামী হিসেবে আমাকে নির্বাচন করল। আমার দিক থেকে আপত্তির কোনো কারণ ছিল না। জুডি চমৎকার একটি মেয়ে। শত বৎসর সাধনার ধন হয়তো নয়, তবে বিনা সাধনায় পাওয়ার মতো মেয়েও নয়।

বিয়ের সাত দিনের মাথায় আমরা হানিমুন করতে চলে গেলাম সানফ্রান্সিসকো। উঠলাম হোটেল বেডফোর্ডে। দ্বিতীয় রাত্রির ঘটনা। ঘুমুচ্ছিলাম। কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি জুডি পাশে নেই। ঘড়িতে রাত তিনটা দশ বাজছে। বাথরুমের দরজা বন্ধ। সেখান থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আসছে। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে গেলাম। দরজা ধাক্কা দিয়ে বললাম, কী হয়েছে? জুডি কী হয়েছে? কান্না থেমে গেল। তবে জুডি কোনো জবাব দিল না।

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর সে দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম, কী হয়েছে?

সে ক্ষীণ স্বরে বলল, ভয় পেয়েছি।

‘কিসের ভয়?’

‘জানি না কিসের ভয়।’

‘ভয় পেয়েছ তো আমাকে ডেকে তোলনি কেন? বাথরুমের দরজা বন্ধ করেছিলে কেন?’

জুডি জবাব দিল না। এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, ব্যাপারটা কী আমাকে খুলে বলো তো?

'সকালে বলব।'

'না, এখনি বলো। কী দেখে ভয় পেয়েছ?'

জুডি অস্পষ্ট স্বরে বলল, তোমাকে দেখে।

'আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ মানে? আমি কী করেছি?'

জুডি যা বলল তা হচ্ছে—রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। হোটেলের ঘরে নাইট লাইট জ্বলছিল, এই আলোয় সে দেখে তার পাশে যে শুয়ে আছে সে কোনো জীবন্ত মানুষ নয়। মৃত মানুষ। যে মৃত মানুষের গা থেকে শবদেহের গন্ধ বেরোচ্ছে। সে ভয়ে কাঁপতে থাকে তবু সাহসে হাত বাড়িয়ে মানুষটাকে স্পর্শ করে। স্পর্শ করেই চমকে উঠে, কারণ মানুষটার শরীর বরফের মতোই শীতল। সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমি মারা গেছি। তার জন্যে এটা বড় ধরনের শক হলেও সে যথেষ্ট সাহস দেখায়—টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দেয় এবং হোটেল ম্যানেজারকে টেলিফোন করবার জন্যে টেলিফোন সেট হাতে তুলে নেয়। ঠিক তখন সে লক্ষ করে মৃতদেহের দুটি বন্ধ চোখের একটি ধীরে ধীরে খুলছে। সেই একটিমাত্র খোলা চোখ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জুডি টেলিফোন ফেলে দিয়ে ছুটে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এই হলো ঘটনা।

রাশেদুল করিম কথা শেষ করে সিগারেট ধরালেন। হাতের ঘড়ি দেখলেন। আমি বললাম, থামলেন কেন?

'সাতটা বেজেছে। আপনি বলেছেন সাতটার সময় আপনার জন্যে চা আসে। আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। চা খেয়ে শুরু করব। আমার গল্প শুনতে আপনার কেমন লাগছে?'

'ইন্টারেস্টিং। এই গল্প কি আপনি অনেকের সঙ্গে করেছেন? আপনার গল্প বলার ধরন থেকে মনে হচ্ছে, অনেকের সঙ্গেই এই গল্প করেছেন।'

'আপনার অনুমান সঠিক। ছয় থেকে সাতজনকে আমি বলেছি। এর মধ্যে সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। পুলিশের লোক আছে।'

'পুলিশের লোক কেন?'

'গল্প শেষ করলেই বুঝতে পারবেন পুলিশের লোক কী জন্যে।'

চা চলে এল। চায়ের সঙ্গে পরোটা-ভাজি। মিসির আলি নাশতা করলেন। রাশেদুল করিম সাহেব পরপর দুকাপ চা খেলেন।

'আমি কি শুরু করব?'

'জি, শুরু করুন।'

'আমাদের হানিমুন মাত্র তিন দিন স্থায়ী হলো। জুডিকে নিয়ে পুরনো জায়গায় চলে এলাম। মনটা খুবই খারাপ। জুডির কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। রোজ রাতে সে ভয়ংকর চিৎকার করে ওঠে। ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আমি যখন জেগে উঠে তাকে সান্ত্বনা দিতে যাই, তখন সে এমনভাবে তাকায় যেন আমি একটা পিশাচ কিংবা মূর্তিমান শয়তান। আমার দুঃখের কোনো সীমা রইল না। সেই সময় নন এবিলিয়ান গ্রুপের ওপর একটা জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলাম। আমার দরকার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার মতো পরিবেশ। মানসিক শান্তি। সব দূর হয়ে গেল। অবশ্যি দিনের বেলায় জুডি স্বাভাবিক। সে বদলাতে শুরু করে সূর্য ডোবার পর থেকে। আমি তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলাম।

সাইকিয়াট্রিস্ট প্রথমে সন্দেহ করলেন সমস্যা ড্রাগঘটিত। হয়তো জুডি ড্রাগে অভ্যস্ত। সেই সময় বাজারে হেলুসিনেটিং ড্রাগ এলএসডি প্রথম এসেছে। শিল্প সাহিত্যের লোকজন শখ করে এই ড্রাগ খাচ্ছেন। বড় গলায় বলছেন—মাইন্ড অলটারিং ট্রিপ নিয়ে এসেছি। জুডি ফাইন আর্টসের ছাত্রী। ট্রিপ নেয়া তার পক্ষে খুব অস্বাভাবিক না।

দেখা গেল ড্রাগঘটিত কোনো সমস্যা তার নেই। সে কখনো ড্রাগ নেয়নি। সাইকিয়াট্রিস্টরা তার শৈশবের জীবনে কোনো সমস্যা ছিল কিনা তাও বের করতে চেষ্টা করলেন। লাভ

হলো না। জুডি এসেছে গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে। এ ধরনের পরিবারে তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তাদের জীবনযাত্রা সহজ এবং স্বাভাবিক।

সাইকিয়াট্রিস্ট জুডিকে ঘুমের ওষুধ দিলেন। কড়া ডোজের ফেনোবারবিটন। আমাকে বললেন, আপনি সম্ভবত লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। স্ত্রীর প্রতি বিশেষ করে নববিবাহিত স্ত্রীর প্রতি যতটা সময় দেয়া দরকার, তা দিচ্ছেন না। আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর একধরনের ক্ষোভ জন্মগ্রহণ করেছে। সে যা বলছে তা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ।

জুডির কথা একটাই—আমি ঘুমুবার পর আমার দেহে প্রাণ থাকে না। একজন মৃত মানুষের শরীর যেমন অসাড় পড়ে থাকে, আমার শরীরও সে রকম পড়ে থাকে। ঘুমের মধ্যে মানুষ হাত নাড়ে, পা নাড়ে—আমি তার কিছুই করি না। নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলি না। গা হয়ে যায় বরফের মতো শীতল। একসময় গা থেকে মৃত মানুষের শরীরের পচা গন্ধ বেরোতে থাকে এবং তখন আচমকা আমার বাঁ চোখ খুলে যায়, সেই চোখে আমি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সেই চোখের দৃষ্টি সাপের মতো কুটিল।

জুডির কথা শুনে আমার ধারণা হলো, হতেও তো পারে। জগতে কত রহস্যময় ব্যাপারই তো ঘটে। হয়তো আমার নিজেরই কোনো সমস্যা আছে। আমিও ডাক্তারের কাছে গেলাম। স্লিপ অ্যানালিস্ট। জানার উদ্দেশ্য একটিই—ঘুমের মধ্যে আমার কোনো শারীরিক পরিবর্তন হয় কি না। ডাক্তাররা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলেন। একবার না, বারবার করলেন। দেখা গেল আমার ঘুম আর দশটা মানুষের ঘুমের চেয়ে আলাদা নয়। ঘুমের মধ্যে আমিও হাত-পা নাড়ি। অন্য মানুষদের যেমন ঘুমের তিনটি স্তর পার হতে হয়, আমারও হয়। ঘুমের সময় আর দশটা মানুষের মতো আমার শরীরের উত্তাপও আধ ডিগ্রি হ্রাস পায়। আমিও অন্য সবার মতো স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন দেখি।

জুডি সব দেখেশুনে বলল, ডাক্তাররা জানে না। ডাক্তাররা কিছুই জানে না। আমি জানি। তুমি আসলে মানুষ না। দিনের বেলা তুমি মানুষ থাক—সূর্য ডোবার পর থাক না।

আমি কী হই?

তুমি পিশাচ বা এই জাতীয় কিছু হয়ে যাও।

আমি বললাম, এইভাবে তো বাস করা সম্ভব না। তুমি বরং আলাদা থাক।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, জুডি তাতে রাজি হলো না। অতি তুচ্ছ কারণে আমেরিকানদের বিয়ে ভাঙে। স্বামীর পছন্দ হলুদ রঙের বিছানার চাদর, স্ত্রীর পছন্দ নীল রঙ। ভেঙে গেল বিয়ে। আমাদের এত বড় সমস্যা কিন্তু বিয়ে ভাঙল না। আমি বেশ কয়েকবার তাকে বললাম, জুডি, তুমি আলাদা হয়ে যাও। ভালো দেখে একটা ছেলেকে বিয়ে করো। সারা জীবন তোমার সামনে পড়ে আছে। তুমি এইভাবে জীবনটা নষ্ট করতে পার না।

জুডি প্রতিবারই বলে, যা-ই হোক, যত সমস্যাই হোক আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, I love you, I love you.

আমি গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শেষ অংশটি বলার আগে আমি আপনাকে আমার চোখের দিকে তাকাতে অনুরোধ করব। দয়া করে আমার চোখের দিকে তাকান।

রাশেদুল করিম সানগ্লাস খুলে ফেললেন। মিসির আলি তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনার চোখ সুন্দর। সত্যি সুন্দর। আপনার মা যে বলতেন—চোখে জন্ম-কাজল, ঠিকই বলতেন।

রাশেদুল করিম বললেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ কার ছিল জানেন?

'ক্লিওপেট্রার'।

'অধিকাংশ মানুষের তাই ধারণা। এ ধারণা সত্যি নয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ ছিল বুদ্ধদেবের পুত্র কুনালের। ইংরেজ কবি শেলীর চোখও খুব সুন্দর ছিল। আমার স্ত্রীর ধারণা, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ আমার। জুডি বলত এই চোখের কারণেই সে কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

রাশেদুল করিম সানগ্লাস চোখে দিয়ে বললেন, গল্পের শেষ অংশ বলার আগে আপনাকে ক্ষুদ্র ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী জন্যে বলুন তো?

'কাউকে যখন আমি আমার চোখের দিকে তাকাতে বলি, সে আমার পাথরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনি প্রথম ব্যক্তি যিনি একবারও আমার পাথরের চোখের দিকে তাকাননি। আমার আসল চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঝড় হরপব ড়ভ ুড়ঁ, ঝরৎ.'

রাশেদুল করিমের গলা মুহূর্তের জন্যে হলেও ভারী হয়ে গেল। তিনি অবশ্যি চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আটটা প্রায় বাজতে চলল, গল্পের শেষটা বলি—

'জুডির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুতে যায়, দু-এক ঘণ্টা ঘুম হয়, বাকি রাত জেগে বসে থাকে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

এমনি এক রাতের ঘটনা। জুলাই মাস। রাত সাড়ে তিনটার মতো হবে। জুড়ির মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল—সে আমার বাঁ চোখটা গেলে দিল।

আমি ঘুমুচ্ছিলাম, নারকীয় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। সেই ভয়াবহ কষ্টের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।'

রাশেদুল করিম চুপ করলেন। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, কী দিয়ে চোখ গেলে দিলেন?

'সুঁচালো পেনসিল দিয়ে। আমার মাথার বালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল থাকে। তখন গ্রুপ থিওরি নিয়ে গভীর চিন্তায় ছিলাম। মাথায় যদি হঠাৎ কিছু আসে, তা লিখে ফেলার জন্যে বালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল রাখতাম।'

'আপনার স্ত্রী এ ঘটনা প্রসঙ্গে কী বক্তব্য দিয়েছেন।'

'তার মাথা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুই বলেনি, শুধু চিৎকার করেছে। তার একটিই বক্তব্য—এই লোকটা পিশাচ। আমি প্রমাণ পেয়েছি। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে।'

‘কী প্রমাণ আছে তা কি কখনো জিজ্ঞেস করা হয়েছে?’

‘না। একজন উন্মাদকে প্রশ্ন করে বিপর্যস্ত করার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া আমি তখন ছিলাম হাসপাতালে। আমি হাসপাতালে থাকতে থাকতেই জুডির মৃত্যু হয়।’

‘স্বাভাবিক মৃত্যু?’

‘না। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। সে মারা যায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে। এইটুকুই আমার গল্প। আমি আপনার কাছে একটাই অনুরোধ নিয়ে এসেছি, আপনি সমস্যাটা কি বের করবেন। আমাকে সাহায্য করবেন। আমি যদি পিশাচ হই তাও আমাকে বলবেন। এই ফাইলের ভেতর জুডির একটা স্কেচ বুক আছে। স্কেচ বুকে নানান ধরনের কমেন্টস লেখা আছে। এই কমেন্টসগুলি পড়লে জুডির মানসিক অবস্থা আঁচ করতে আপনার সুবিধা হতে পারে। আটটা বাজে, আমি তাহলে উঠি?’

‘আবার কবে আসবেন?’

‘আগামীকাল ভোর ছয়টায়। ভালো কথা, আমার এই গল্পে কোথাও কি প্রকাশ পেয়েছে জুডিকে আমি কতটা ভালোবাসতাম?’

‘না, প্রকাশ পায়নি।’

‘জুডির প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। আমি এখন উঠছি।’

‘ছিল বলছেন কেন? এখন কি নেই?’

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না।

রাশেদুল করিম চলে যাবার পর মিসির আলি ফাইল খুললেন। ফাইলের শুরুতেই একটা খাম। খামের ওপর মিসির আলির নাম লেখা।

মিসির আলি খাম খুললেন। খামের ভেতর ইংরেজিতে একটা চিঠি লেখা। সঙ্গে চারটি এক শ ডলারের নোট। চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সার্ভিসের জন্য সম্মানী বাবদ সামান্য কিছু দেয়া হলো। গ্রহণ করলে খুশি হব।
বিনীত
আর করিম।

চোখ (২য় অংশ)

মিসির আলি স্কেচ বুকের প্রতিটি পাতা সাবধানে ওল্টালেন। চারকোল এবং পেনসিলে স্কেচ আঁকা। প্রতিটি স্কেচের নিচে আঁকার তারিখ। স্কেচের বিষয়বস্তু অতি তুচ্ছ, সবই ঘরোয়া জিনিস—এক জোড়া জুতা, মলাট ছেঁড়া বই, টিভি, বুক শেলফ। স্কেচ বুকের শেষের দিকে শুধুই চোখের ছবি। বিড়ালের চোখ, কুকুরের চোখ, মাছের চোখ এবং মানুষের চোখ। মানুষের চোখের মডেল যে রাশেদুল করিম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। না বললেও ছবির নিচের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। মন্তব্যগুলি বেশ দীর্ঘ। যেমন একটি মন্তব্য—

আমি খুব মন দিয়ে আমার স্বামীর চোখ লক্ষ্য করছি। মানুষের চোখ একেক সময় একেক রকম থাকে। ভোরবেলার চোখ এবং দুপুরের চোখ এক নয়। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম চোখের আইরিশের ট্রান্সপারেন্সি মুডের ওপর বদলায়। বিষাদগ্রস্ত মানুষের চোখের আইরিশ থাকে অস্বচ্ছ। মানুষ যতই আনন্দিত হতে থাকে তার চোখের আইরিশ ততই স্বচ্ছ হতে থাকে। আমার এই অবজারভেশন কতটুকু সত্য তা বুঝতে পারছি না।

মেয়েটি মাঝে মাঝে তার মনের অবস্থাও লিখেছে—অনেকটা ডায়েরি লেখার ভঙ্গিতে। মনে হয় হাতের কাছে ডায়েরি না থাকায় স্কেচ বুকে লিখে রেখেছে। সব লেখাই পেনসিলে। প্রচুর কাটাকুটি আছে। কিছু লাইন রাবার ঘষে তুলেও ফেলা হয়েছে।

আমি ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি—এই ভয় অমুলক। বোঝাতে পারছি না। আমি আমার স্বামীকে ভয় পাচ্ছি এই তথ্য স্বভাবতই স্বামী বেচারার জন্যে সুখকর না। সে নানাভাবে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু চেষ্টা বেশ

হাস্যকর। আজ আমাকে বলল, জুডি আমি ঠিক করেছি, এখন থেকে রাতে ঘুমুব না। আমার অঙ্কের সমস্যা নিয়ে ভাবব। লেখালেখি করব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও। আমি দিনের বেলায় ঘুমুব। একজন মানুষের জন্যে চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। নেপোলিয়ান মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমুতেন।

আমি এই গম্ভীর, স্বল্পভাষী লোকটিকে ভালোবাসি। ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। আমি চাই না, আমার কোনো কারণে সে কষ্ট পাক। কিন্তু সে কষ্ট পাচ্ছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে। হে ঈশ্বর, তুমি আমার মন শান্ত কর। আমার ভয় দূর করে দাও।

যে জিনিস খুব সুন্দর তা কত দ্রুত অসুন্দর হতে পারে—বিস্মিত হয়ে আমি তাই দেখছি। রাশেদের ধারণা আমি অসুস্থ। সত্যি কি অসুস্থ? আমার মনে হয় না। কারণ এখনো ছবি আঁকতে পারছি। একজন অসুস্থ মানুষ আর যাই পারুক—ছবি আঁকতে পারে না। গত দুদিন ধরে ওয়াটার কালারে বাসার সামনের চেরী গাছের ফুল ধরতে চেষ্টা করছিলাম। আজ সেই ফুল কাগজে বন্দি করেছি। অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভালো হয়েছে। রাশেদ ছবি তেমন বুঝে বলে মনে হয় না—সেও মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর বলল, আমি যখন বুড়ো হয়ে যাব, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেব, তখন তুমি আমাকে ছবি আঁকা শিখিয়ে দেবে। এই কথাটি সে আজ প্রথম বলেনি। আগেও বলেছে। আন্তরিক ভঙ্গিতে বলেছে। কেউ যখন আন্তরিকভাবে কিছু বলে তখন তা টের পাওয়া যায়। আমার মনে হয় না সে কোনোদিন ছবি আঁকবে। তার মাথায় অঙ্ক ছাড়া কিছুই নেই।

আমি ছবি আঁকতে পারছি না। যেখানে নীল রঙ চড়ানো দরকার সেখানে গাঢ় হলুদ রঙ বসাচ্ছি। ডাক্তার সিডেটিভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ মাথা ঝিম ধরে থাকে। কেন জানি খুব বমি হচ্ছে।

আজ দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমুলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সুন্দর একটা স্বপ্নও দেখে ফেললাম। সুন্দর স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না।

অনেকদিন দেখি না। আচ্ছা, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? শুনেছি পাগলরাই একই কথা বারবার লেখে। কারণ তাদের মাথায় একটি বাক্যই বারবার ঘুরপাক খায়।

বৃহস্পতিবার কিংবা বুধবার—

আজ কত তারিখ আমি জানি না। বেশ কয়েকদিন ধরেই দিন-তারিখে গণ্ডগোল হচ্ছে। আজ কত তারিখ তা জানার কোনো রকম আগ্রহ বোধ করছি না। তবে মনের অবস্থা লেখার চেষ্টা করছি যাতে পরবর্তী সময়ে কেউ আমার লেখা পড়ে বুঝবে যে মাথা খারাপ হবার সময় একজন মানুষ কী ভাবে। কী চিন্তা করে।

মাথা খারাপের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, আলো অসহ্য হওয়া। আমি এখন আলো সহ্য করতে পারি না। দিনের বেলায় দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখি। ঘর অন্ধকার বলেই প্রায় অনুমানের ওপর নির্ভর করে আজকের এই লেখা লিখছি। দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে, সারাক্ষণ শরীরে একধরনের জ্বালা অনুভব করা। মনে হয় সব কাপড় খুলে বাথটাবে শুয়ে থাকতে পারলে ভালো লাগত। আমার আগে যারা পাগল হয়েছে তাদেরও কি এমন হয়েছে? জানার জন্যে পাবলিক লাইব্রেরিতে টেলিফোন করেছিলাম। আমি খুব সহজভাবে বললাম, আচ্ছা আপনাদের এখানে পাগলের লেখা কোনো বই আছে?

যে মেয়েটি টেলিফোন ধরেছিল সে বিস্মিত হয়ে বলল, পাগলের লেখা বই বলতে কী বোঝাচ্ছেন?

‘মানসিক রোগীদের লেখা বই।’

‘মানসিক রোগীরা বই লিখবে কেন?’

‘কেন লিখবে না। আমি তো লিখছি, বই অবশ্যি নয়—ডায়েরির আকারে লেখা।’

‘ও আচ্ছা। ঠিক আছে আপনার বই ছাপা হোক। ছাপা হবার পর অবশ্যই আমরা আপনার বই-এর কপি সংগ্রহ করব।’

আমি মনে মনে হাসলাম। মেয়েটি আমাকে উন্মাদ ভাবছে। ভাবুক উন্মাদকে উন্মাদ ভাববে না তো কী ভাববে?

রাত দুটা দশ—

আমার মা, এই কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করলেন। দুপুর রাতে তাঁর টেলিফোন করার বদঅভ্যাস আছে। আমার মার অনিদ্রা রোগ আছে। কাজেই তিনি মনে করেন পৃথিবীর সবাই অনিদ্রা রোগী। যা-ই হোক, আমি জেগে ছিলাম। মা বললেন, জুডি তুই আমার কাছে চলে আয়। আমি বললাম, না রাশেদকে ফেলে আমি যাব না।

মা বললেন, আমি তো শুনলাম ওকে নিয়েই তোর সমস্যা।

'ওকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই মা। ও ষড়াব যরস, ও ষড়াব যরস, ও ষড়াব যরস.

'চিৎকার করছিস কেন?'

'চিৎকার করছি না। মা, টেলিফোন রাখি। কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। রাশেদকে ফেলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমার ধারণা রাশেদ নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেও এখন রাতে ঘুমায় না। গ্রুপ থিওরির যে সমস্যাটি নিয়ে সে ভাবছিল, সেই সমস্যার সমাধান অন্য কে নাকি বের করে ফেলেছে। জার্নালে ছাপা হয়েছে। সে গত পরশু ঐ জার্নাল পেয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে। শুধু তা-ই না— বারান্দার এক কোণায় বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে শুরু করেছে। আমি সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার কাছে গিয়ে চমকে উঠলাম। সে কাঁদছে ঠিকই কিন্তু তার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। ডান চোখ শুকনো।

আমি তাকে কিছু বললাম না। কিন্তু সে আমার চাউনি থেকেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। নিচু গলায় বলল, জুডি ইদানীং এই ব্যাপারটা হচ্ছে—মাঝে মাঝেই দেখছি বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

কথাগুলি বলার সময় তাকে এত অসহায় লাগছিল যে আমার ইচ্ছা করছিল তাকে জড়িয়ে ধরে বলি—I love you, I love you, I love you.

হে ঈশ্বর! হে পরম করুণাময় ঈশ্বর! এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে তুমি আমাদের দুজনকে উদ্ধার করো।

স্কেচ বুকের প্রতিটি লেখা বারবার পড়ে মিসির আলি খুব বেশি তথ্য বের করতে পারলেন না, তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা জানা গেল তা হচ্ছে—মেয়েটি তার স্বামীকে ভালোবাসে। যে ভালোবাসায় একধরনের সারল্য আছে।

স্কেচ বুকে কিছু স্প্যানিশ ভাষায় লেখা কথাবার্তাও আছে। স্প্যানিশ ভাষা না জানার কারণে তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। তবে এই লেখাগুলি যেভাবে সাজানো তাতে মনে হচ্ছে—কবিতা কিংবা গান হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মডার্ন ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটে স্কেচ বুক নিয়ে গেলেই ওরা পাঠোদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেবে—তবে মিসির আলির মনে হলো তার প্রয়োজন নেই, যা জানার তিনি জেনেছেন। এর বেশি কিছু জানার নেই।

চোখ (৩য় অংশ)

রাশেদুল করিম ঠিক ছয়টায় এসেছেন। মনে হচ্ছে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক ছয়টা বাজার পর কলিং বেলে হাত রেখেছেন। মিসির আলি দরজা খুলে বললেন, আসুন।

রাশেদুল করিমের জন্যে সামান্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তার জন্যে টেবিলে দুধ ছাড়া চা। মিসির আলি বললেন, আপনি কাঁটায় কাঁটায় ছয়টায় আসবেন বলে ধারণা করেই চা বানিয়ে রেখেছি। লিকার কড়া হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। খেয়ে দেখুন তো।

রাশেদুল করিম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ।

মিসির আলি নিজের কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, আপনাকে একটা কথা শুরুতেই বলে নেয়া দরকার। আমি মাঝে মাঝে নিজের শখের কারণে—সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি। তার জন্যে কখনো অর্থ গ্রহণ করি না। আমি যা করি তা আমার পেশা না—নেশা বলতে পারেন। আপনার ডলার আমি নিতে পারছি না। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়ই আমি সমস্যার কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারি না। আমার কাছে পাঁচ শ পৃষ্ঠার একটা নোট বই আছে। ঐ নোট বই ভর্তি এমন সব সমস্যা—যার সমাধান আমি বের করতে পারিনি।

'আপনি কি আমার সমস্যাটার কিছু করেছেন?'

'সমস্যার পুরো সমাধান বের করতে পারিনি—আংশিক সমাধান আমার কাছে আছে। আমি মোটামুটিভাবে একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি। সেই সম্পর্কে আপনাকে আমি বলব, আপনি নিজে ঠিক করবেন—আমার হাইপোথিসিসে কী কী ত্রুটি আছে। তখন আমরা দুজন মিলে ত্রুটিগুলি ঠিক করব।'

'শুনি আপনার হাইপোথিসিস।'

'আপনার স্ত্রী বলেছেন, ঘুমুবার পর আপনি মৃত মানুষের মতো হয়ে যান। আপনার হাত-পা নড়ে না। পাথরের মূর্তির মতো বিছানায় পড়ে থাকেন। তাই না?'

'হ্যাঁ—তাই।'

'স্লিপ অ্যানালিস্টরা আপনাকে পরীক্ষা করে বলেছেন—আপনার ঘুম সাধারণ মানুষের ঘুমের মতোই। ঘুমের মধ্যে আপনি স্বাভাবিকভাবেই নড়াচড়া করেন।'

'জি—কয়েকবারই পরীক্ষা করা হয়েছে।'

'আমি আমার হাইপোথিসিসে দুজনের বক্তব্যই সত্য ধরে নিচ্ছি। সেটা কিভাবে সম্ভব? একটিমাত্র উপায়ে সম্ভব—আপনি যখন বিছানায় শুয়েছিলেন তখন ঘুমুচ্ছিলেন না। জেগে ছিলেন।'

রাশেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বললেন, কী বলছেন আপনি?

মিসির আলি বললেন, আমি গতকালও লক্ষ্য করেছি—আজও লক্ষ্য করছি আপনার বসে থাকার মধ্যেও একধরনের কাঠিন্য আছে। আপনি আরাম করে বসে নেই—শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছেন। আপনার দুটা হাত হাঁটুর ওপর রাখা। দীর্ঘ সময় চলে গেছে আপনি একবারও হাত বা পা নাড়াননি। অথচ স্বাভাবিকভাবেই আমরা হাত-পা নাড়ি। কেউ কেউ পা নাচান।

রাশেদুল করিম চুপ করে রইলেন। মিসির আলি বললেন, ঐ রাতে আপনি বিছানায় শুয়েছেন—মূর্তির মতো শুয়েছেন। চোখ বন্ধ করে ভাবছেন আপনার অঙ্কের সমস্যা নিয়ে। গভীরভাবে ভাবছেন। মানুষ যখন গভীরভাবে কিছু ভাবে তখন একধরনের ট্রেন্স স্টেটে ভাবজগতে চলে যায়। গভীরভাবে কিছু ভাবা হচ্ছে একধরনের মেডিটেশন। রাশেদুল করিম সাহেব।

'জি।'

'অঙ্ক নিয়ে ঐ ধরনের গভীর চিন্তা কি আপনি প্রায়ই করেন না?'

'জি, করি।'

'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন এই সময় আশেপাশে কী ঘটছে তা আপনার খেয়াল থাকে না।'

'লক্ষ্য করেছি।'

'আপনি নিশ্চয়ই আরো লক্ষ্য করেছেন যে এই অবস্থায় আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিচ্ছেন। লক্ষ্য করেননি?'

'করেছি।'

'তাহলে আমি আমার হাইপোথিসিসে ফিরে আসি। আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন। আপনার মাথায় অঙ্কের জটিল সমস্যা। আপনি ভাবছেন, আর ভাবছেন। আপনার হাত-পা নড়ছে না। নিঃশ্বাস এত ধীরে পড়ছে যে মনে হচ্ছে আপনি মৃত।'

রাশেদুল করিম সাহেব সানগ্লাস খুলে—এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, ভালো কথা আপনি কি লেফ্ট হ্যানডেড পারসন? ন্যাটা?

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

'আমার হাইপোথিসিসের জন্যে আপনার লেফ্ট হ্যানডেড পারসন হওয়া খুবই প্রয়োজন।'

'কেন?'

'বলছি। তার আগে—শুরুতে যা বলছিলাম সেখানে ফিরে যাই। দৃশ্যটি আপনি দয়া করে কল্পনা করুন। আপনি একধরনের ট্রেন্স অবস্থায় আছেন। আপনার স্ত্রী জেগে আছেন—ভীত চোখে আপনাকে দেখছেন। আপনার এই অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা হলো আপনি মারা গেছেন। তিনি আপনার গায়ে হাত দিয়ে আরো ভয় পেলেন। কারণ আপনার গা হিমশীতল।'

'গা হিমশীতল হবে কেন?'

'মানুষ যখন গভীর ট্রেন্স স্টেটে চলে যায় তখন তার হার্টবিট কমে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে বয়। শরীরের টেম্পারেচার দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যায়। এইটুকু নেমে যাওয়া মানে অনেকখানি নেমে যাওয়া। যা-ই হোক আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি তাকালেন—তাকালেন, কিন্তু এক চোখ মেলে। বাঁ চোখে। ডান চোখটি তখনো বন্ধ।'

'কেন?'

'ব্যাখ্যা করছি। রাইট হ্যানডেড পারসন যারা আছে তাদের এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখে তাকাতে বললে তারা বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখে তাকাবে। ডান চোখ বন্ধ করে বাঁ চোখে তাকানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সম্ভব শুধু যারা ন্যাটা তাদের জন্যেই। আপনি লেফট্ হ্যানডেড পারসন—আপনি একধরনের গভীর ট্রেন্স স্টেটে আছেন। আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত রেখেছেন। আপনি কী হচ্ছে জানতে চাচ্ছেন। চোখ মেলছেন। দুটি

চোখ মেলতে চাচ্ছেন না। গভীর আলস্যে একটা চোখ কোনোমতে মেললেন—অবশ্যই সেই চোখ হবে বাঁ চোখ। আমার যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

রাশেদুল করিম হ্যাঁ-না কিছু বললেন না।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার স্ত্রী আরো ভয় পেলেন। সেই ভয় তার রক্তে মিশে গেল। কারণ শুধুমাত্র একবার এই ব্যাপার ঘটেনি, অনেকবার ঘটেছে। আপনার কথা থেকেই আমি জেনেছি সেই সময় অঙ্কের একটি জটিল সমাধান নিয়ে আপনি ব্যস্ত। আপনার সমগ্র চিন্তা-চেতনায় আছে—অঙ্কের সমাধান—নতুন কোনো থিওরি। নয়-কি?

'হ্যাঁ'।

'এখন আমি আমার হাইপোথিসিসের সবচেয়ে জটিল অংশে আসছি। আমার হাইপোথিসিস বলে আপনার স্ত্রী আপনার চোখ গেলে দেননি। তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। তিনি আপনার চোখের প্রেমে পড়েছিলেন। একজন শিল্পী মানুষ কখনো সুন্দর কোনো সৃষ্টি নষ্ট করতে পারেন না। তবু যদি ধরে নিই তাঁর মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে গিয়েছিল এবং তিনি এই ভয়াবহ কাণ্ড করেছেন—তাহলে তাঁকে এটা করতে হবে ঝোঁকের মাথায়—আচমকা। আপনার চোখ গেলে দেয়া হয়েছে পেনসিলে, যে পেনসিলটি আপনার মাথার বালিশের নিচে রাখা। যিনি ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করবেন তিনি এত যন্ত্রণা করে বালিশের নিচ থেকে পেনসিল নেবেন না। হয়তোবা তিনি জানতেনও না বালিশের নিচে পেনসিল ও নোট বই নিয়ে আপনি ঘুমান।'

রাশেদুল করিম বললেন, কাজটি তাহলে কে করেছে?

'সেই প্রসঙ্গে আসছি, আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন? বানিয়ে দেব?'

'না।'

'এ্যাকসিডেন্ট কিভাবে ঘটল তা বলার আগে আপনার স্ত্রীর লেখা ডায়েরির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, আপনার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ত। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'কেন পানি পড়ত? একটি চোখ কেন কাঁদত? আপনার কী ধারণা?'

রাশেদুল করিম বললেন, 'আমার কোনো ধারণা নেই। আপনার ধারণাটা বলুন। আমি অবশ্যি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ডাক্তার বলেছেন, 'এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। যে গ্ল্যান্ড চোখের জল নিয়ন্ত্রণ করে সেই গ্ল্যান্ড বাঁ চোখে বেশি কর্মক্ষম ছিল।'

মিসির আলি বললেন, এটা 'একটা মজার ব্যাপার। হঠাৎ কেন বাঁ চোখের গ্ল্যান্ড কর্মক্ষম হয়ে পড়ল। আপনি মনে মনে এই চোখকে আপনার সব রকম অশান্তির মূল বলে চিহ্নিত করার জন্যেই কি এটা হলো? আমি ডাক্তার নই। শরীরবিদ্যা জানি না। তবে আমি দুজন বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন, এটা হতে পারে। মোটেই অস্বাভাবিক নয়। গ্ল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। একটি চোখকে অপছন্দও করছে মস্তিষ্ক।

'তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে?'

মিসির আলি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, তাতে একটি জিনিসই প্রমাণিত হচ্ছে— আপনার বাঁ চোখ আপনি নিজেই নষ্ট করেছেন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে রাশেদুল করিম ভাঙা গলায় বললেন, কী বলছেন আপনি?

'কনসাস অবস্থায় আপনি এই ভয়ংকর কাজ করেননি। করেছেন সাব কনসাস অবস্থায়। কেন করেছেন তাও বলি, আপনি আপনার স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসেন। সেই স্ত্রী আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। কেন দূরে সরে যাচ্ছেন? কারণ তিনি ভয় পাচ্ছেন আপনার বাঁ চোখকে। আপনি আপনার স্ত্রীকে হারাচ্ছেন বাঁ চোখের জন্যে। আপনার ভেতর রাগ, অভিমান জমতে শুরু করেছে। সেই রাগ আপনার নিজের একটি প্রত্যঙ্গের ওপর। চোখের

ওপর। এই রাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রচণ্ড হতাশা। আপনি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন সেই গবেষণা অন্য একজন করে ফেলেছেন। জার্নালে তা প্রকাশিত হয়ে গেছে। আপনার চোখ সমস্যা তৈরি না করলে এমনটা ঘটত না। নিজেই গবেষণাটা শেষ করতে পারতেন। সব কিছুর জন্যে দায়ী হলো চোখ।'

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমার এই হাইপোথিসিসের পেছনে আরেকটি শক্ত যুক্তি আছে। যুক্তিটি বলেই আমি কথা শেষ করব।

'বলুন।'

'আপনার স্ত্রী পুরোপুরি মস্তিষ্কবিকৃত হবার পরে যে কথাটা বলতেন, তা হলো—এই লোকটা পিশাচ। আমার কাছে প্রমাণ আছে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রমাণ আছে। তিনি এই কথা বলতেন কারণ পেনসিল দিয়ে নিজের চোখ নিজের গেলে দেয়ার দৃশ্য তিনি দেখেছেন। আমার হাইপোথিসিস আমি আপনাকে বললাম। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।'

রাশেদুল করিম দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন।

মিসির আলি আরেকবার বললেন, ভাই, চা করব? চা খাবেন?

তিনি এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। উঠে দাঁড়ালেন। চোখে সানগ্লাস পরলেন। শুকনো গলায় বললেন, যাই?

মিসির আলি বললেন, মনে হচ্ছে আমি আপনাকে আহত করেছি—কষ্ট দিয়েছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। নিজের ওপরেও রাগ করবেন না। আপনি যা করেছেন প্রচণ্ড ভালোবাসা থেকেই করেছেন।

রাশেদুল করিম হাত বাড়িয়ে মিসির আলির হাত ধরে ফেলে বললেন, আমার স্ত্রী বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম—আপনি দেখতেন সে কী চমৎকার একটি মেয়ে ছিল। এবং সেও দেখত—আপনি কত অসাধারণ একজন মানুষ। ঐ দুর্ঘটনার

পর জুডির প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে আমি বেঁচে ছিলাম। আপনি এই অন্যায় ঘৃণা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। জুডির হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
ভদ্রলোকের গলা ধরে এল। তিনি চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলে বললেন, মিসির আলি সাহেব। ভাই দেখুন—আমার দুটি চোখ থেকেই এখন পানি পড়ছে। চোখ পাথরের হলেও চোখের অশ্রুগ্রন্থি এখনো কার্যক্ষম। কুড়ি বছর পর এই ঘটনা ঘটল। আচ্ছা ভাই, যাই।
দুমাস পর আমেরিকা থেকে বিমান ডাকে মিসির আলি বড় একটা প্যাকেট পেলেন। সেই প্যাকেটে জল রঙে আঁকা একটা চেরী গাছের ছবি। অপূর্ব ছবি।
ছবির সঙ্গে একটি নোট। রাশেদুল করিম সাহেব লিখেছেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি আপনাকে দিতে চাচ্ছিলাম। এই ছবিটির চেয়ে প্রিয় কিছু এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না।

জিন-কফিল

জায়গাটার নাম ধুন্দুল নাড়া।

নাম যেমন অদ্ভুত, জায়গাও তেমন জঙ্গুলে। একবার গিয়ে পৌঁছলে মনে হবে সভ্যসমাজের বাইরে চলে এসেছি। সেখানে যাবার ব্যবস্থাটা বলি-প্রথমে যেতে হবে ঠাকারোকোণা। ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ ব্রাঞ্চ-লাইনের ছোট্ট স্টেশন। ঠাকরোকোণা থেকে গয়নার নৌক যায় হাতির বাজার পর্যন্ত। যেতে হবে হাতির বাজারে। ভাগ্য ভালো হলে হাতির বাজারে কেরায়া নৌকা পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায়। সেই নৌকায় শিয়ালজানি খাল ধরে মাইল দশেক উত্তরে যেতে হবে। বাকি পথ পায়ে হেঁটে। পেরুতে হবে মাঠ, ডোবা, জলাভূমি। জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিতে হবে। পা কাটবে ভাঙা শামুকে। গোটা বিশেক জোঁক ধরবে। বিশ্রী অবস্থা কতটা হাঁটতে হবে তারও অনুমান নেই। একেক জন একেক কথা বলবে?

একটা সময় আসবে যখন লোকজন সুপ্রিমুখ স্কুল-থুগুল নাড়া ঐ তো দেখা যায়। তখন বুঝতে হবে আরো মাইল সাতেক বাকি।

বছর পাঁচেক আগে এই জঙ্গুলো জায়গায় আমাকে জনৈক সাধুর সন্ধানে যেতে হয়েছিল। সাধুর নাম—কালু খাঁ। মুসলমান নাম হলেও সাধু হিন্দু ব্রাহ্মণ। বাবা-মা তাঁকে শৈশবেই পরিত্যাগ করেন। তিনি মানুষ হন মুসলিম পরিবারে। কালু খাঁ নাম তাঁর মুসলমান পালক বাবার দেওয়া। যৌবনে তিনি সংসারত্যাগী হয়ে শ্মশানে আশ্রয় নেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, বিভূতির কোনো সীমাসংখ্যা নেই। তিনি কোনোরকম খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর গা থেকে সবসময় কাঁঠালচাঁপু ফুলের তীব্র গন্ধ বের হয়। পূর্ণিমার সময় সেই গন্ধ এত তীব্র হয় যে, কাছে গেলে বমি এসে যায়। নাকে রুমাল চেপে কাছে যেতে হয়।

সাধু-সন্ন্যাসী, তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা এইসব নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাসু করি।–ব্যাখ্যার অতীত কোনো ক্ষমতা প্রকৃতি দেয় নি। কোনো সাধু যদি আমার চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে থাকেন, আমি চমৎকৃত হব না। ধরে নেব। এর পিছনে আছে ম্যাজিকের সহজ কিছু কলাকৌশল, যা এই সাধু আয়ত্ত করেছেন। কাজেই আমার পক্ষে সাধুর খোঁজে ধুন্দুল নাড়া নামের অজ পাড়াগায় যাবার প্রশ্নই আসে না। যেতে হয়েছিল সফিকের কারণে।

সফিক আমার বাল্যবন্ধু। সে বিশ্বাস করে না এমন জিনিস নেই। ভূত-প্রেত থেকে সাধু-সন্ন্যাসী সবকিছুতেই তার অসীম বিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও সে বিশ্বাস করে যে, সাপের মাথায় মণি আছে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে এই মণি সে উগরে ফেলে। চারদিক আলো হয়ে যায়। আলোয় আকৃষ্ট হয়ে পোক-মাকড় আসে। সাপ তাদের ধরেধরে খায়। ভোজনপর্ব শেষ হলে আবার গিলে ফেলে।

সাধু কালু খাঁর খবর সফিকই নিয়ে এল এবং এমন ভাব করতে লাগল যে, অবতারের সন্ধান পেয়ে গেছে।–যে-অবতারের সঙ্গে দেখা না হলে জীবন বৃথা।

আমি সফিকের সঙ্গে রওনা হলাম দুটি কারণে—এক, সফিককে অত্যন্ত পছন্দ করি। তাকে এক-একা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। দুই, সাধু খোঁজা উপলক্ষে গ্রামের দিকে খানিকটা হলেও ঘোরা হবে। মাঝে-মাঝে এ-রকম ঘুরে বেড়াতে মন্দ লাগে না। নিজেকে পরিব্রাজক-পরিব্রাজক মনে হয়। যেন আমি ফা হিয়েন। বাংলার পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

খুব আগ্রহ নিয়ে রওনা হলেও আগ্রহ হাতির বাজারে পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গেল। অমানুষিক পরিশ্রম হল। হাতির বাজার থেকে যে-কেরায়া নৌকা নিলাম সেনৌকাও এখন ডোবে তখন ডোবে অবস্থা। নৌকার পাটাতনের ফুটা দিয়ে বিজবিজ করে পানি উঠছে। সারাক্ষণ সেই পানি সোঁচতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সফিকের মতো পাগলেরও ধৈর্যচ্যুতি হল। কয়েক বার বলল, বিরাট বোকামি হয়েছে। গ্রেট মিসটেক। এর চেয়ে কঙ্গো নদীর উৎস বের করা সহজ ছিল।

আমি বললাম, এখনো সময় আছে। ফিরে যাবি কি না বল।

আরে না। এতদূর এসে ফিরে যাব মানে! ভালো জিনিসের জন্যে কষ্ট করতেই হবে। জাি্ষ্ট চিন্তা করে দেখু-একজন মানুষের গা থেকে ভূত্রভুর করে কাঁঠালচাঁপা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে। ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে হাউ এক্সাইটিং।

সন্ধ্যার পরপর ধুন্দুল নাড়া গ্রামে উপস্থিত হলাম। কাদায় পানিতে মাখামাখি। তিন বার বৃষ্টিতে ভিজেছি। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় জীবন বের হবার উপক্রম। বিদেশি মানুষ দেখলেই গ্রামের লোকজন সাধারণত খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে। এইখানে উল্টে নিয়ম দেখলাম। আমাদের ব্যাপারে কারো কোনো অনুগ্রহ নেই। কোথেকে এসেছি? যাবো কোথায়? দায়িত্ব পালন করার ভঙ্গিতে এইটুকু জিজ্ঞেস করেই সবাই চলে যাচ্ছে! এ কী যন্ত্রণা!

সাধু কালু খাঁ-কে দেখেও খুব হতাশ হতে হল। বদ্ধ উন্মাদ একজন মানুষ। শ্মশানে একটা পাকুড় গাছের নিচে ন্যাংটো অবস্থায় বসা। আমাদের দেখেই গালাগালি শুরু করল! গালাগালি যে এত নোংরা হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমাকে এবং সফিককে কালু খাঁ সবচেয়ে ভদ্র কথা যা বলল তা হচ্ছে, বাড়িত্ যা। বাড়িত্ গিয়া খাবলাইয়া-খাবলাইয়া গু খা।

আমি হতভম্ব। ব্যাটা বলে কী।

সফিকের দিকে তাকলাম। সে ভাব-গদগদ স্বরে বলল, লোকটার ভেতর জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, কী করে বুঝলি? আমাদের গু খেতে বলেছে, এই জন্যে?

আরে না। সে আমাদের এড়াতে চাচ্ছে। মানুষের সংসর্গ পছন্দ নয়। মানুষের হোত থেকে উদ্ধার পাওয়ার এটা সহজ টেকনিক।

লোকটা যে বদ্ধ উন্মাদ, তা তোর মনে হচ্ছে না?

তাও মনে হচ্ছে। তবে একটা প্রবাবিলিটি আছে যে, সে উন্মাদ না।

গ্রামের কয়েক জন বয়স্ক মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। সাধুর প্রতি তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধাও সফিকের মতোই। তাঁদের একজন বললেন, বাবার মাথা এখন একটু গরম।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, মাথা ঠাণ্ডা হবে কখন?

ঠিক নাই। চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ।

চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ মানে?

অমাবস্যা-পূর্ণিমায় মাথা গরম থাকে।

এই ব্যাপারেও মতভেদ দেখা গেল। একজন বলল, অমাবস্যামাথাটা ঠাণ্ডা থাকে। অন্য সময় গরম। বাবার কাছে মাসের পর মাস পড়ে থাকতে হয়। অপেক্ষা করতে হয়। কখন বাবার মাথা ঠাণ্ডা হবে।

আমি বললাম, সফিক, বাবার গা থেকে ফুলের গন্ধ তো কিছু পাচ্ছি না। আমাদের যে-দ্রব্য খেতে বলছিল তার গন্ধ পাচ্ছি। তুই কি পাচ্ছিস?

সফিক জবাব দেবার আগেই আমাদের সঙ্গী মানুষের একজন ভীত গলায় বলল, একটু দূরে যান। বাবা অখন টিল মারব। আইজ মনে হইতাছে বাবার মিজাজ বেশি খারাপ

কথা শেষ হবার আগেই টিলকৃষ্ট শুরু হল। দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলাম। বাবার কাণ্ডকারখানায় সফিকের অবশ্যি মোহভঙ্গ হল না। সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলল, দুটো দিন থেকে দেখি। এতদূর থেকে আসা। ভালো— মতো পরীক্ষা না-করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

আর কী পরীক্ষা করবি?

মানে ওনার মাথা যখন ঠাণ্ডা হবে তখন দু-একটা কথাটথা জিজ্ঞেস করলে...

আমি হাল ছেড়ে দেওয়া গলায় বললাম, থাকবি কোথায়?

স্কুলঘরে শুয়ে থাকব। খানিকটা কষ্ট হবে। কী আর করা! কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না।

জানা গেল। এই গ্রামে কোনো স্কুল নেই। পাশের গ্রামে প্রাইমারি স্কুল আছে-এখান থেকে ছ মাইলের পথ। তবে গ্রামে পাকা মসজিদ আছে। অতিথি মোসাফির এলে মসজিদে থাকে। মসজিদের পাশেই ইমাম সাহেব আছেন। তিনি অতিথিদের খোঁজখবর করেন। প্রয়োজনে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

আমি খুব একটা উৎসাহ বোধ করলাম না। গ্রামের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম সাহেব লোক কেমন?

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দার্শনিকের মতো বলল, ভালোয়-মন্দয় মিলাইয়া মানুষ। কিছু ভালো, কিছু মন্দ।

এই উত্তরও আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হল। উপায় নেই। আকাশে আবার মেঘা জমতে শুরু করেছে। রওনা হলাম মসজিদের দিকে। গ্রামের লোকগুলো অভদ্রের চূড়ান্ত। কেউ সঙ্গে এল না। কীভাবে যেতে হবে বলেই ভাবল আমাদের জন্যে অনেক করা হয়েছে।

মসজিদ খুঁজে বের করতেও অনেক সময় লাগল।

অন্ধকার রাত। পথঘাট কিছুই চিনি না। সঙ্গে টর্চলাইট ছিল-বৃষ্টিতে ভিজে সেই টর্চলাইটও কাজ করছে না। অন্ধের মতো এগুতে হচ্ছে। যাকেই জিজ্ঞেস করি সে-ই খুন্টু জেরা করে—সুমাঘরে যাইতে চান কান? কার কাছে যাইবেন? আপনের পরিচয়?

শেষ পর্যন্ত মসজিদ পাওয়া গেল। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা খালের পাশে মসজিদ। মসজিদের বয়স খুব কম হলেও দু, শ বছরের কম হবে না। বিশাল স্তূপের মতো একটা ব্যাপার। সেই স্তূপের সবটাই শ্যাওলায় ঢাকা। গা বেয়ে উঠেছে বটগাছ। সব মিলিয়ে কেমন গা-ছিমছামানি ব্যাপার আছে।

আমাদের সাড়াশব্দ পেয়ে হারিকেন হাতে ইমাম সাহেব চলে এলেন। ছোটখাটো মানুষ। খালি গা। কাঁধে গামছা চাদরের মতো জড়ানো। বয়স চল্লিশের মতো হবে। দাড়িতে তাকে খানিকটা আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের মতো দেখাচ্ছে। আমার ধারণা ছিল মসজিদে রাত্রি যাপন করব। শুনে তিনি বিরক্ত হবেন। হল উল্টোটা। তাঁকে আনন্দিত মনে হল। নিজেই বালতি করে পানি এনে দিলেন। গামছা আনলেন। দু জোড়া খড়ম নিয়ে এলেন। সফিক বলল, ভাই, আমাদের খাওয়াদাওয়া দরকার। সারাদিন উপোস। টাকা পয়সা নিয়ে যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ইমাম সাহেব বললেন, ব্যবস্থা হবে জনাব। আমার বাড়িতেই গরিবি হালতে ডালভাতের ব্যবস্থা।

নাম কি আপনার?

মুনশি এর তাজউদ্দিন।

থাকেন কোথায়, আশেপাশেই?

মসজিদের পিছনে-ছোট্ট একটা টিনের ঘর আছে।

কে কে থাকেন?

আমার স্ত্রী, আর কেউ না।

ছেলেমেয়ে?

ছেলেমেয়ে নাই জনাব। আল্লাহপাক সন্তান দিয়েছিলেন, তাদের হায়াত দেন নাই। হায়াত-মউত সবই আল্লাহপাকের হাতে। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করেন, আমি আসতেছি।

ভদ্রলোক ছোট-ছোট পা ফেলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সফিক বলল, ইমাম সাহেবকে নিতান্ত ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। মাই ডিয়ার টাইপ। মনে হচ্ছে আমাদের দেখে খুশি হয়েছেন।

আমি বললাম, ভদ্রলোক জঙ্গুলে জায়গায় একা পড়ে আছেন-আমাদের দেখে সেই কারণেই খুশি। এই মসজিদে নামাজ পড়তে কেউ আসে বলে আমার মনে হয় না।

বুঝলি কি করে?

লোকজনের যাতায়াত থাকলে পায়ে চলার পথ থাকত। পথ দেখলাম না।

সফিক হাসতে— হাসতে বলল, মিসির আলির সঙ্গে থেকে-থেকে তোর অবজারভেশন পাওয়ার বেড়েছে বলে মনে হয়।

কিছুটা তো বেড়েছেই। ইমাম সাহেব আমাদের বসিয়ে রেখে যে চলে গেলেন, কী নিয়ে ফিরবেন জানিস?

কী নিয়ে?

দু হাতে দুটো কাটা ডাব নিয়ে।

এই তোর অনুমান?

আমি হাসিমুখে বললেন, মিসির আলি থাকলে এই অনুমানই করতেন। অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে গ্রামে প্রচুর ডাব গাছ। অতিথিদের ডাব দেওয়া সনাতন রীতি।

লজিক তো ভালোই মনে হচ্ছে।

আমার লজিক ভুল প্রমাণ করে মুনশি এর তাজউদ্দিন ট্রে হাতে উপস্থিত হলেন। টেতে দু কাপ চা। একবাটি তেল-মরিচ মাখা মুড়ি। এই অতি পাড়াগাঁ জায়গায় অভাবনীয় ব্যাপার তো বটেই। মফস্বলের চা অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত মিষ্টি এবং অতিরিক্ত কড়া হয়। তবু চা হচ্ছে চা চর্বিশ ঘন্টা পর প্রথম চায়ে চুমুক দিলাম, মনটা ভালো হয়ে গেল। চমৎকার চা। বিস্মিত হয়ে বললাম, চা কে বানিয়েছে? আপনার স্ত্রী?

ইমাম সাহেব লাজুক মুখে বললেন, জ্বি। তার চায়ের অভ্যাস আছে। শহরের মেয়ে আমার শ্বশুরসাহেব হচ্ছেন নেত্রকোণার বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিন! নাম শুনেছেন বোধহয়।

আমরা এমন ভঙ্গি করলাম যে নামটা আমাদের কাছে অপরিচিতি নয়, আগে অনেক বার শুনেছি।

ইমাম সাহেব বললেন, আমি চা খাই না। আমার স্ত্রীর চায়ের অভ্যাস আছে। শহর থেকে ভালো চায়ের পাতা এনে দিতে হয়। বিরাট খরচান্ত ব্যাপার।

আপনি কি ইমামতি ছাড়া আর কিছু করেন?

জ্বি-না। সামান্য জমিজমা আছে। আধি দেই। আমার শ্বশুর সাহেব তাঁর মেয়ের নামে নেত্রকোণা শহরে একটা ফার্মেসি দিয়েছেন-সানরাইজ ফার্মেসি। তার আয় মাসে-মাসে আসে। রিজিকের মালিক আল্লাহ্ পাক। তাঁর ইচ্ছায় চলে যায়।

ভালো চলে বলেই তো মনে হচ্ছে।

জ্বি জনাব, ভালোই চলে। সংসার ছোট ছেলেপূলে নাই।

এশার নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিল। ইমামসাহেব আজান দিয়ে নামাজ পড়তে গেলেন। কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নামাজে আসতে দেখলাম না। ইমাম- সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জুনলাম-আলোক এমনিতেই হত না। দু বছর ধরে একেবারেই হচ্ছে না। শুধু জুম্মাবারে কিছু মুসুল্লি আসেন।

লোকজন না-হওয়ার কারণও বিচিত্র। মসজিদ সম্পর্কে গুজব রটে গেছে, এখানে জিন থাকে। নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়লে জিন তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। নানান ধরনের যন্ত্রণা করে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, জিন কি সত্যি-সত্যি আছে?

আছে। আল্লাহপাক কোরান মজিদে বলেছেন। একটা সূরা আছে–সুরায়ে জিন!

সেই কথা জিজ্ঞেস করছি না–জানতে চাচ্ছি জিন গিয়ে বিরক্ত করে এটা সত্যি কিনা।

জ্বি জনাব, সত্য। তবে লোকজন জিনের ভয়ে মসজিদে আসে না-এটা ঠিক না, আসলে সাপের ভয়ে আসে না।

সাপের ভয়ে আসে না। কী বলছেন আপনি?

একবার নামাজের মাঝখানে সাপ বের হয়ে গেল। দাঁড়াস সাপ। অবশ্য কাউকে কামড়ায় নাই। বাস্তুসাপ কামড়ায় না। মাঝেমধ্যে ভয় দেখায়।

সফিক আঁৎকে উঠে বলল, মাই গড়! যখন-তখন সাপ বের হলে এইখানে থাকব কীভাবে?

ভয়ের কিছু নাই। কার্বলিক এসিড ছড়ায়ে দিব।

কার্বলিক এসিড আছে?

জ্বি! নেত্রকোণার ফর্মেসি থেকে তিন বোতল নিয়ে আসছি। আমার স্ত্রীরও খুব সাপের ভয়। এই অঞ্চলে সাপখোপ একটু বেশি।

মসজিদের সামনে উঁচু চাতালমতো জায়গায় বসে আছি। সাপের ভয়ে খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত। আকাশে মেঘ ডাকছে। বড় ধরনের বর্ষণ মনে হচ্ছে আসন্ন। ইমাম সাহেব বুলুন, খাওয়া দিতে একটু দেরি হবে। আমার স্ত্রী সব একা করছে।–লোকজন নাই।

তাব দেখে মনে হচ্ছে-বিরাট আয়োজন।

জ্বি-না, আয়োজন কিছুনা, দরিদ্র মানুষ। আপনারা এসেছেন শুনে আমার স্ত্রী খুব খুশি। কেউ আসে না। আমি বলতে গেলে একা থাকি সবাই আমাকে ভয় করে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

সবার একটা ধারণা হয়েছে। আমি জিন পুষি। জিনদের দিয়ে কাজকর্ম

সত্য না জনাব। তবে মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে! অসত্য বিশ্বাস করা সহজ, কারণ শয়তান অসত্য বিশ্বাসে সাহায্য করে।

ইমাম সাহেব বেশ মন খারাপ করে চুপ হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গ পাল্টাবর জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, সাধু কালু খাঁ সম্পর্কে কী জানেন?

ইমাম সাহেব বললেন, তেমন কিছু জানি না। তবে আপনাদের মতো দূর-দূর থেকে ওনার কাছে লোকজন আসে—এইটা দেখেছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোকরাই আসে বেশি। ময়মনসিংহের ডি, সি, সাহেব ওনার পত্নীকে নিয়ে এসেছিলেন।

ওনার ক্ষমতাটমতা কিছু আছে?

মনে হয় না। কুৎসিত গালাগালি করেন। কামেল মানুষের এই রকম গালিগালাজ করার কথা না। তা ছাড়া কালু খাঁর কারণে অনেক বেদান্তী কাণ্ডকারখানা হয়। এইগুলাও ঠিক না।

কী কাণ্ডকারখানা হয়?

উনি নগ্ন থাকেন। এইজন্য অনেকের ধারণা নগ্ন অবস্থায় তাঁর কাছে গেলে তাঁর মেজাজ ঠিক থাকে। অনেকেই নগ্ন অবস্থায় যান।

সে কী।

উনি পাগলমানুষ। সমস্যার কারণে যাঁরা তাঁর কাছে আসেন তাঁরাও এক অর্থে পাগল। পাগলামানুষের কাজকর্ম তো এই রকমই হয়। সমস্যা হলে তার পরিত্রাণের জন্য

আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কান্নাকাটি করতে হয়। মানুষ তা করে না, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির খোঁজে।

ইমাম সাহেবের কথাবার্তায় আমি অবাক হলাম। পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা। গ্রাম্য মসজিদের ইমামের কাছ থেকে এমন যুক্তিনির্ভর কথা আশা করা যায় না। লোকটির প্রতি আমার একধরনের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হল। তা ছাড়া ভদ্রলোকের আচার-আচরণেও সহজ। সারল্য আছে, যে-সারল্যের দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না।

রাত নটার দিকে ইমাম সাহেব বললেন, চলেন যাই, খানা বোধহয় এর মধ্যে তৈরি হয়েছে। ডাল-ভাত-এর বেশি কিছু না। নিজ গুণে ক্ষমা করে চারটা মুখে ইমাম সাহেবের বাড়িটা ছোট্ট টিনের দু-কামরার বাড়ি। একচিলতে উঠেন। বাড়ির চারদিকে দর্মার বেড়া! আমাদের ঘরে নিয়ে বসানো হল। মেঝেতে শতরঞ্জি বিছানো। থালা-বাসন সাজানো! আমরা সঙ্গে-সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। খাবারের আয়োজন অল্প হলেও ভালো। সজি, ছোটো মাছের তরকারি, ডাল এবং টকজাতীয় একটা খাবার। ইমাম সাহেব আমাদের সঙ্গে বসলেন না। খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। খাবারের শেষ পর্যায়ে আমাদের অবাক করে দিয়ে ইমাম সাহেবের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন, এবং শিশুর মতো কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটল যে আমি বেশ হকচাকিয়েই গেলাম। অজ পাড়াগাঁয়ে এটা অভাবনীয়। কঠিন পর্দাপ্রথাই আশা করেছিলাম। আমি খানিকটা সংকুচিত হয়েই রইলাম! ইমাম সাহেবকেও দেখলাম খুব অপ্রস্তুত বোধ করছেন।

সফিক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কেমন আছেন?

ইমাম সাহেবের স্ত্রী সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, ভালো নাই। আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে। জ্বিনটার নাম কফিল। কফিল আমারে খুব ত্যক্ত করে।

সফিক হতভম্ব হয়ে বলল, আপনি কী বললেন, বুঝলাম না।

মেয়েটি যন্ত্রের মতো বলল, আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে। জ্বিনটার নাম কফিল। কফিল আমারে বড় যন্ত্রণা করে।

সফিক অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি নিজেও বিস্মিত। ব্যাপার কী কিছু বুঝতে পারছি না। ইমাম সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন- লতিফা, তুমি একটু ভিতরে যাও।

ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ক্যান? ভিতরে ক্যান? থাকলে কী অসুবিধা?

ওনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলব! তুমি না থাকলে ভালো হয়। সব কথা মেয়েছেলেদের শোনা উচিত না।

লতিফা তীব্র চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। খাওয়া বন্ধ করে আমরা হাত গুটিয়ে বসে রইলাম। এ কী সমস্যা!

লতিফা মেয়েটি রূপবতী। শুধু রূপবতী নয়, চোখে পড়ার মতো রূপবতী। হালকাপাতলা শরীর। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। লম্বাটে স্নিগ্ধ মুখ। বয়সও খুব কম মনে হচ্ছে। দেখাচ্ছে আঠার-উনিশ বছরের তরুণীর মতো। এত কম বয়স তার নিশ্চয় নয়। যার স্বামীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স আঠার-উনিশ হতে পারে না। আরো একটি লক্ষ করার

মতো ব্যাপার হল-মেয়েটি সাজগোজ করেছে। চুল বেঁধেছে, চোখে কাজল দিয়েছে-কপালে। লাল রঙের টিপ। গ্রামের মেয়েরা কপালে টিপ দেয় বলেও জানতাম ন।

ইমাম সাহেব। আবার বললেন, লতিফ, ভিতরে যাও।

মেয়েটি উঠে চলে গেল।

ইমাম সাহেব গলার স্বর নিচু করে বললেন, লতিফার মাথা পুরাপুরি ঠিক না। ওরা দুটো সন্তান নষ্ট হয়েছে। তারপর থেকে এ-রকম। তার ব্যবহারে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি তার হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। কিছু মনে করবেন। না।–আল্লাহর দোহাই।

আমি বললাম, কিছুই মনে করি নি। তা ছাড়া মনে করার মতো কিছু তো উনি করেন নি।

ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, জিনের কারণে এ-রকম করে। জিনটা তার সঙ্গে-সঙ্গে আছে। মাঝে-মাঝে মাসখানিকের জন্য চলে যায়। তখন ভালো থাকে। গত এক মাস ধরে তার সাথে আছে।

আপনি এ-সব বিশ্বাস করেন?

বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না-করার তো কিছু নাই। বাতাস আমরা চোখে দেখি না, কিন্তু বাতাস বিশ্বাস করি। কারণ বাতাসের নানান আলামত দেখি। সেই রকম জিন কফিলেরও নানান আলামত দেখি।

কী দেখেন?

জিন যখন সঙ্গে থাকে, তখন লতিফা খুব সাজগোজ করে। কথায়-কথায় হাসে, কথায়-কথায় কাঁদে।

জিন তাড়াবার ব্যবস্থা করেন নি?

করেছি। লাভ হয় নাই। কফিল খুব শক্ত জিন। দীর্ঘদিন লতিফার সঙ্গে আছে।

প্রথম সন্তান যখন গর্ভে আসল তখন থেকেই কফিল আছে।

জিন চায় কী?

ইমাম সাহেব মাথা নিচু করে রইলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হল-জিন বোধহয় লতিফ মেয়েটিকেই স্ত্রী হিসেবে চায়। বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের চিন্তা মাথায় আসছে দেখে আমি নিজের ওপরও বিরক্ত হলাম। ইমাম সাহেব বললেন, এই জিনটা আমার দুইটা বাচ্চা মেরে ফেলেছে। আবার যদি বাচ্চা হয় তারেও মারবে। বড় মনকষ্টে আছি জনাব। দিন-রাত আল্লাহপাকেরে ডাকি। আমি গুনাহগার মানুষ, আল্লাহপাক আমার কথা শুনেন না।

আপনার স্ত্রীকে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?

ডাক্তার কী করবে? ডাক্তারের কোনো বিষয় না। জিনের ওষুধ ডাক্তারের কাছে নাই।

তবু একবার দেখালে হত না?

আমার শ্বশুরসাহেব দেখিয়েছিলেন। একবার লতিফাকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। শ্বশুরসাহেব তারে ঢাকা নিয়ে গেলেন। চিকিৎসাটিকিৎসা করালেন। লাভ হল না।

বারান্দা থেকে গুনগুন শব্দ আসছে। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম—খুবই মিষ্টি গলায় টেনে- টেনে গান হচ্ছে—যার কথাগুলোর বেশির ভাগই অস্পষ্ট। মাঝে-মাঝে দু- একটা লাইন বোঝা যায়, যার কোনো অর্থ নেই। যেমন:

এতে না দেহে না দেহে না এতে না।

ইমাম সাহেব উঁচু গলায় বললেন, লতিফা, চুপ কর। চুপ কর বললাম।

গান থামিয়ে লতিফা বলল, তুই চুপ কর। তুই থাম শুয়োরের বাচ্চা।

অবিকল পুরুষের ভারি গলা। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই পুরুষকণ্ঠ থমথমে স্বরে বলল, চুপ কইরা থাকবি। একটা কথা কইলে টান দিয়া মাথা আলগা করুম। শইল থাকব একখানে মাথা আরেকখানে। শুয়োরের বাচ্চা আমারে চুপ করতে কয়।

আমরা হাত ধুয়ে উঠে পড়লাম। এত কাণ্ডের পর খাওয়াদাওয়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। এ-জাতীয় যন্ত্রণায় পড়ব, কখনো ভাবি নি।

সফিক নিচু গলায় বলল, বিরাট সমস্যা হয়ে গেল দেখি ভয়ভয় লাগছে। কী করা যায় বল তো?

মসজিদের ভেতর এর আগে কখনো রাত্রি যাপন করি নি। অস্বস্তি নিয়ে ঘুমুতে গেলাম। কেমন যেন দম-বন্ধ দম-বন্ধ লাগছে। মসজিদের একটিমাত্র দরজা-সেটি পেছন দিকে। ভেতরে গুমোট ভাব! ইমাম সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করেছেন। স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণজনিত লজ্জা হয়তো-বা। ঢাকার চেষ্টা করেছেন। আমাদের জন্যে দুটো শীতল পাটি, পাটির চারপাশে কার্বলিক এসিড ছড়ানো হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা-দুটো মশারি খাটানো হয়েছে।

ইমাম সাহেব বললেন, ভয়ের কিছু নাই। হারিকেন জ্বালানো থাকবে। আলোতে সাপ আসে না। দরজা বন্ধ। সাপ ঢোকারও পথ নাই।

আমি খুব, যে ভরসা পাচ্ছি, তা নয়। চৌকি এনে ঘুমুতে পারলে হত। মসজিদের ভেতর চৌকি পেতে শোয়া-ভাবাই যায় না।

সফিকের হচ্ছে ইচ্ছা!ঘুম! শোয়ামাত্র নাক ডাকতে শুরু করেছে। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মসজিদের ভেতর আগরবাতির গন্ধ। যে-গন্ধ সবসময় মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে গা ছমছমানো ব্যাপার।

আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, আপনি চলে যান, আপনি এখানে বসে আছেন কেন? আপনার স্ত্রী একা। তাঁর শরীরও ভালো না।

ইমাম সাহেব বললেন, আমি মসজিদেই থাকব। এবাদত-বন্দেগি করব। ফজরের নামাজ শেষ করে বাসায় গিয়ে ঘুমুব।

কেন?

লতিফা এখন আমাকে দেখলে উন্মাদের মতো হয়ে যাবে। মেঝেতে মাথা ঠুকবে।

কেন?

ওর দোষ নাই কিছু। সঙ্গে জিন আছে-কফিল। এই জিনই সবকিছু করায়।

আমি চুপ করে রইলাম! ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, এমনিতে তেমন উপদ্রব করে না। সন্তানসম্ভবা হলেই কফিল ভয়ংকর যন্ত্রণা করে। বাচ্চাটা মেরে না ফেলা পর্যন্ত থামে না। দুইটা বাচ্চা মেরেছে—এইটাও মারবে।

আপনার স্ত্রী কি সন্তানসম্ভব?

জ্বি।

আপনি কি নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটা জিন করছে, অন্য কিছু না?

জ্বি, নিশ্চিত। জিনের সঙ্গে আমার মাঝেমধ্যে কথা হয়।

অবিশ্বাস্য সব কথাবার্তা বলছেন আপনি!

অবিশ্বাসের কিছু নাই। একদিনের ঘটনা বলি-তাহলে বুঝবেন। ভাদ্র মাস। গরম। একটা ভেজা গামছা শরীরে জড়ায়ে এশার নামাজে দাঁড় হয়েছি। মসজিদে একা। আমি ছাড়া আর

কেউ নাই। হঠাৎ দপ করে হারিকোনটা নিভে গেল। চমকে উঠলাম। তারপর শুনি মসজিদের পিছনের দরজার কাছে ধূপ-ধূপ শব্দ। খুব ভয় লাগল। নামাজ ছেড়ে উঠতে পারি না! নামাজে মনও দিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর পিছনের দরজায় ধুপ ধুপ শব্দ। যেন কেউ কিছু একটা এনে ফেলছে। সেজদায় যাবার সময় কফিলের গলা শুনলাম— টেনে- টেনে বলল, তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তারপর ধাপ করে আগুন জ্বলে উঠল। দাউদাউ আগুন। নামাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। দেখি দরজার কাছে গাদা করা শুকনা লাকড়ি। আগুন জ্বলছে। আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম— বাঁচাও, বাঁচাও আমার চিৎকার শুনে লতিফ পানির বালতি হাতে ছুটে আসল। পানি দিয়ে আগুন নিভায়ে আমারে মসজিদ থেকে টেনে বার করল! আমার স্ত্রীর কারণে সেই যাত্রা বেঁচে গেলাম। লতিফা সময়মতো না আসলে মারা পড়তাম।

জিন মসজিদের ভেতরে ঢুকল না কেন?

খারাপ ধরনের জীন। আল্লাহর ঘরে এরা ঢুকতে পারে না। আমি এই জন্যই বেশির ভাগ সময় মসজিদে থাকি। মসজিদে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারি। ঘরে পারি না।

কফিল আপনাকে খুন করতে চায়?

তাও ঠিক না–একবারই চেয়েছিল। তারপর আর চায় নাই।

খুন করতে চেয়েছিল কেন?

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, আপনার যদি আপত্তি না থাকে পুরো ঘটনাটা বলুন। আপত্তি থাকলে বলার দরকার নেই।

না, আপত্তির কী আছে? আপত্তির কিছু নাই। আমি লতিকার অবস্থা একটু দেখে যান, দেখে আসি।

যান, দেখে আসুন।

ইমাম সাহেব চলে গেলেন। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগিলাম। ভূত, প্রেত, জিন, পরীকখনো বিশ্বাস করি নি- এখনো করছি না, তবু আতঙ্কে আধমরা হয়ে গেছি। সফিক জেগে থাকলে খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। সে ঘুমুচ্ছে মড়ার মতো। একেই বলে পরিবেশ। ইমাম সাহেব দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। বিরস গলায় বললেন, ভালোই আছে, তবে ভীষণ চিৎকার করছে।

তালাবন্ধ করে রেখেছেন?

জ্বি-না। তালাবন্ধ করে তাকে রাখা সম্ভব না। কফিল ওর সঙ্গে থাকে-কাজেই ওর গায়ের জোর থাকে অসম্ভব। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

ইমাম সাহেব মন-খারাপ করে বসে রইলেন। আমি কালাম, গল্পটা শুরু করুন ভাই।

কথা পুরোপুরি শেষ করতে পারলেন না। মসজিদে প্রচণ্ড শব্দে ঢিল পড়তে লাগল। ধূপধুপ শব্দ। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে কয়েকজন মানুষ যেন চারদিকে ছোটাছুটি করছে। আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, কী ব্যাপার?

ইমাম সাহেব বললেন, কিছু না। কফিল চায় না। আমি কিছু বলি।

থাক ভাই, বাদ দিন। গল্প বলার দরকার নেই।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই টিল। ছোঁড়া বন্ধ হবে। ভয়ের কিছুই নাই।

সত্যি-সত্যি বন্ধ হল। বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগল। ইমাম সাহেব গল্প শুরু করলেন। আমি তাঁর গল্পটাই বলছি। তাঁর ভাষাতে। তবে আঞ্চলিকতাটা সামান্য বাদ গল্পের মাঝখানেও একবার তুমুল ঢিল ছোঁড়া হল। ইমাম সাহেব একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লেন। আমার জীবনে সে এক ভয়াবহ রাত।

.

২.

নেত্রকোণা শহরের বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে তখন আমি থাকি। ওনার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়সম্পর্ক নাই। লোকমুখে শুনেছিলাম–বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কেউ কোনো বিপদে পড়ে। তাঁর কাছে গেলে তিনি যথাসাধ্য করেন। আমার তখন মহাবিপদ। এক বেলা খাই তো এক বেলা উপোস দেই। সাহসে ভর করে তাঁর কাছে গেলাম চাকরির জন্য। উনি বললেন, চাকরি যে দিব, পড়াশোনা কী জানো?

আমি বললাম, উলা পাস করছি।

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, মাদ্রাসা পাস-করা লোক, তোমারে আমি কী চাকরি দিব! আই.এ.বি.এ. পাস থাকলে কথা ছিল। চেষ্টাচরিত্র করে দেখতাম। চেষ্টা করারও তো কিছু নাই।

আমি চুপ করে রইলাম! মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বড় আশা ছিল কিছু হবে। একটা পয়সা সঙ্গে নাই। উপোস দিচ্ছি। রাতে নেত্রকোণা স্টেশনে ঘুমাই।

মমতাজ সাহেব বললেন, তোমাকে চাকরি দেওয়া সম্ভব না। নেও, এই বিশটা টাকা রাখ। অন্য কারো কাছে যাও। মসজিদে খোঁজটোজ নাও–ইমামতি পাও কি না দেখ।

আমি টাকাটা নিলাম। তারপর বললাম, ভিক্ষা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। ঘরের কোনো কাজকর্ম থাকে বলেন, করে দেই।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, কী কাজ করতে চাও?

যা বলবেন করব। বাগানের ঘাসগুলো তুলে দেই?

আচ্ছা দাও।

আমি বাগান পরিষ্কার করে দিলাম। গাছগুলোতে পানি দিলাম। দু-এক জায়গায় মাটি কুপিয়ে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ করে বললাম, জনাব যাই। আপনার অনেক মেহেরবানী। আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমি আপনার জন্য দোয়া করি।

মমতাজ সাহেব বললেন, এখন যাবে কোথায়?

ইস্টিশনে। রাত্রে নেত্রকোণা ইস্টিশনে আমি ঘুমাই।

এক কাজ করা। রাতটা এইখানেই থাক। তারপর দেখি।

আমি থেকে গেলাম।

এক দিন দুই দিন তিনদিন চলে গেল। উনি কিছু বলেন না। আমিও কিছু বলি না। বাংলাঘরের এক কোণায় থাকি। বাগান দেখাশোনা করি। চাকরির সন্ধান করি। ছোট শহর, আমার কোনো চিনা-পরিচয়ও নাই। কে দেবে চাকরি? ঘুরাঘুরি সারা হয়। মোক্তার সাহেবের সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়। আমি বড়ই শরমিন্দা বোধ করি। উনিও এমন ভাব করেন যেন আমাকে চেনেন না। মাসখানেক এইভাবে চলে গেল। আমি মোটামুটি তাঁদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। মোক্তার সাহেবের স্ত্রীকে মা ডাকি। ভেতরের বাড়িতে খেতে যাই। তাঁদের কোনো—একটা উপকার করার সুযোগ পেলে প্রাণপণে করার চেষ্টা করি। বাজার করে দেই। কাল থেকে পানি তুলে দেই।

মোক্তার সাহেবের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাবার সঙ্গে আছে। তার দুই বাচ্চাকে আমি আমপারা পড়াই। বাজার-সদাই করে দেই। টিপকাল থেকে রোজ ছয়সাত বালতি পানি তুলে দেই। মোক্তার সাহেবের কাছে যখন মক্কেলরা আসে, তিনি ঘনঘন তামাক খান। সেই তামাকও আমি সেজে দেই। চাকরবাকারের কাজ। আমি আনন্দের সঙ্গেই করি। মাঝে-মাঝে মনটা খুবই খারাপ হয়। দরজা বন্ধ করে একমনে। কোরান শরিফ পড়ে। আল্লাহপাকরে ডেকে বলি-হে আল্লাহ্, আমার একটা উপায় করে দাও। কতদিন আর মানুষের বাড়িতে অন্নদাস হয়ে থাকব?

আল্লাহপাক মুখ তুলে তাকালেন। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বলে এক ব্যবসায়ী বলতে গেলে সোধে আমাকে চাকরি দিয়ে দিলেন। চালের আড়তে হিসাবপত্র রাখা। মাসিক বেতন পাঁচ শ টাকা।

মোক্তার সাহেবকে সালাম করে খবরটা দিলাম। উনি খুবই খুশি হলেন। বললেন, তোমাকে অনেকদিন ধরে দেখতেছি। তুমি সৎ স্বভাবের মানুষ! কাজ করা, তোমার আয়-উন্নতি হবে। আর রাতে তুমি আমার বাড়িতেই থাক। তোমার কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়াদাওয়াও এইখানেই করবে। তোমাকে আমি ঘরের ছেলের মতোই দেখি।

আনন্দে মনটা ভরে গেল। চোখে পানি এসে গেল। আমি মোক্তার সাহেবের কথামতো তাঁর বাড়িতেই থাকতে লাগলাম। ইচ্ছা করলে চালের আড়তে থাকতে পারতাম। মন টানল না। তা ছাড়া মোক্তার সাহেবের বাগানটা নিজের হাতে তৈরি করেছি। দিনের মধ্যে কিছুটা সময় বাগানে না থাকলে খুব অস্থির-অস্থির লাগে।

একমাস চাকরির পর প্রথম বেতন পেলাম! পাঁচ শ টাকার বদলে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ছ শ টাকা দিয়ে বললেন, তোমার কাজকর্ম ভালো। এইভাবে কাজকর্ম করলে বেতন আরো বাড়িয়ে দিব।

আমার মনে বড় আনন্দ হল। আমি তখন একটা কাজ করলাম। পাগলামিও বলতে পারেন! বেতনের সব টাকা খরচ করে মোক্তার সাহেবের স্ত্রী এবং তাঁর তিন মেয়ের জন্য চারটা শাড়ি কিনে ফেললাম। টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি। মোক্তার সাহেবের জন্য একটা খদ্দরের চাদর।

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, তোমার কি মাথাটা খারাপ? এইটা তুমি কী করলা? বেতনের প্রথম টাকা-তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনের জন্য জিনিস কিনবা, বাড়িতে টাকা পাঠাইবা।

আমি বললাম, মা, আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নাই। আপনারাই আমার আত্মীয়স্বজন।

তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, কই, কোনোদিন তো কিছু বল নাই!

আপনি জিজ্ঞেস করেন নাই–এই জন্য বলি নাই। আমার বাবা-মা খুব ছোটবেলায় মারা গেছেন। আমি মানুষ হয়েছি। এতিমখানায়। এতিমখানা থেকেই উলা পাস করেছি।

উনি আমার কথায় মনে খুব কষ্ট পেলেন। উনার মনটা ছিল পানির মতো। সবসময় টলটল করে। উনি বললেন, কিছু মনে নিও না। আমার আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। তুমি আমারে মা ডাক আর আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না-এইটা খুবই অন্যায় কথা। আমার খুব অন্যায় হইছে।

তিনি তাঁর তিন মেয়েরে ডেকে বললেন, তোমরা এরে আইজ থাইক্যা নিজের ভাইয়ের মতো দেখবা। মনে করুবা তোমরার এক ভাই। তার সামনে পর্দা করার দরকার নাই।

এর মধ্যে একটা বিশেষ জরুরি কথা বলতে ভুলে গেছি।–মোক্তার সাহেবের ছোটো মেয়ে লতিফার কথা। এই মেয়েটা পরীর মতো সুন্দর। একটু পাগল ধরনের নিজের মনে কথা বলে। নিজের মনে হাসে যখন—তখন বাংলা-ঘরে চলে আসে। আমার সঙ্গে দুই-একটা টুকটাক কথাও বলে। অদ্ভুত সব কথা! একদিন এসে বলল, এই যে মৌলানা সাব, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো—শয়তান পুরুষ না মেয়েছেলে?

আমি বললাম, শয়তান পুরুষ।

লতিফা বলল, আল্লা মেয়ে-শয়তান তৈরি করেন নাই কেন?

আমি বললাম, তা তো জানি না। আল্লাহপাকের ইচ্ছার খবর কেমনে জানব? আমি অতি তুচ্ছ মানুষ।

কিন্তু শয়তান যে পুরুষ তা আপনি জানেন?

জানি।

আপনে ভুল জানেন। শয়তান পুরুষও না স্ত্রীও না! শয়তান আলাদা এক জাত।

আমি মেয়েটার বুদ্ধি দেখে খুবই অবাক হই। এই রকম সে প্রায়ই করে। একদিনের কথা। ছুটির দিন। দুপুর বেলা। বাংলাঘরে আমি ঘুমাচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। অবাক হয়ে দেখি, লতিফা আমার ঘরে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। লতিফা বলল, আপনেরে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো–

হেন কোন গাছ আছে। এ-ধরায়

স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।

আমি ধাঁধার জবাব না-দিয়ে বললাম, তুমি কখন আসছ?

লতিফা বলল, অনেকক্ষণ হইছে আসছি। আপনে ঘুমাইতেছিলেন, আপনারে জাগাই নাই! এখন বলেন-ধাঁধার উত্তর দেন,

হেন কোন গাছ আছে। এ-ধরায়

স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।

আমি বললাম, এইটার উত্তর জানা নাই।

উত্তর খুব সোজা। উত্তর হইল-পরগাছা। আচ্ছা আরেকটা ধরি বলেন দেখি–

পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়

এ কেমন ফল বল তো আমায়?

মেয়েটার কাণ্ডকারখানায় আমার ভয়ভয় লাগতে লাগল। কেন সে এই রকম করে? কেন বারবার আমার ঘরে আসে? লোকের চোখে পড়লে নানান কথা। রটবে। মেয়ে যত সুন্দর তারে নিয়া রটনাও তত বেশি।

লতিফা আমার বিছানায় বসন্তে-বসতে বলল, কই বলেন এটার উত্তর কি–

পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়

এ কেমন ফল বল তো আমায়?

বলতে পারলেন না! এটা হল- শশা! পাকা শশা কেউ খায় না। সবাই কাঁচা শশা চায়। আচ্ছা আপনার বুদ্ধি এত কম কেন? একটাও পারেন না। আপনি একটা ধাঁধা ধরেন। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বলে দেব।

আমি ধাঁধা জানি না লতিফা।

আপনি কী জানেন? শুধু আল্লাহ-আল্লাহ করতে জানেন, আর কিছু জানেন?

লতিফা, তুমি এখন ঘরে যাও।

ঘরেই তো আছি। এইটা ঘর না? এইটা কি বাহির?

যুখন-তখন তুমি আমার ঘরে আসা- টা ঠিক না।

ঠিক না কেন? আপনি কি বাঘ না ভালুক?

আমি চুপ করে রইলাম। আধা-পাগল ই মেয়েকে আমি কী বলব? ই মেয়ে কদিন নিজে বিপদে পড়বে, আমাকেও বিপদে ফেলবে। লতিফা বলল, আমি যে মাঝুেমুলার খানে আসি—সেইটা আপনার ভালো লাগে না-ঠিক না?

হ্যাঁ, ঠিক।

ভালো লাগে না কেন?

নানান জনে নানান কথা বলতে পারে।

কী কথা বলতে পারে? আপনার সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়ে গেছে? চুপ করে আছেন কেন, বলেন।

তুমি এখন যাও লতিফা।

আচ্ছা যাই। কিন্তু আমি আবার আসব। রাত-দুপুরে আসব। তখন দেখবেন-কী বিপদ!

কেন এই রকম করতেছ লতিফা?

লতিফা উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, যে ভয় পায় তাকে ভয় দেখাতে আমার ভালো লাগে। ইজন্যে এএরকম করি। আচ্ছা মৌলানা সাহেব, যাই। আসসালামু আলায়কুম। ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু। হি-হি-হি।

ভাই, আপনার কাছে সত্য কথা গোপন করব না। সত্য গোপন করা বিরাট অন্যায়। আল্লাহ্পাক সত্য গোপনকারীকে পছন্দ করেন না। চাকরি পাওয়ার পরেও আমি মোক্তার সাহেবের বাড়িতে থেকে গেলাম শুধু লতিফার জন্য। তারে দেখার জন্য মনটা ছটফট করত। মনে-মনে অপেক্ষা করতাম কোন সময় তারে কনজার হলেও দেখব। তার পায়ের শব্দ শুনলেও বুক ধড়ফড় করত। রাত্রে ভালো ঘুম হত না। শুধু লতিফার কথা ভাবতাম! বলতে খুব শরম লাগছে ভাই-সাব, তবু বলি-লতিফার চুলের কাটা কাঁটা আমি সবসময় আমার সঙ্গে রাখতাম। আমার কাছে মনে হত— ইটা চুলের কাঁটা না, সাত রাজার ধন।

আমি আল্লাহপাকের দরবারে কান্নাকাটি কুরতাম। বলতাম।–হে পরোয়ারদিগার, হে গাফুরুর রহিম, তুমি আমাকে –কি বিপদে ফেললা। তুমি আমারে উদ্ধার করা।

আল্লাহপাক আমাকে উদ্ধার করলেন। লতিফার বিবাহের প্রস্তাব আসল। ছেলে এম.বি.বি.এস. ডাক্তার। বাড়ি গৌরীপুর। ভালো বংশ। খান্দানি পরিবার। ছেলে নিজে সে মেয়ে দেখে গেল। মেয়ে তার খুব পছন্দ হল। পছন্দ না-হওয়ার কোনো কারণ নাই। লতিফার মতো রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেও দেখতে শুনতে ভালো। শুধু গায়ের রঙটা একটু ময়লা। কথায় বার্তায়ও ছেলে অতি ভদ্র। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল। বারই শ্রাবণ। শুক্রবার দিবাগত রাত্রে বিবাহ পড়ানো হবে।

আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। আমি জানি, ই মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোথায় সে আর কোথায় আমি। চাকরীশ্রেণীর আশ্রিত কজন মানুষ। জমিজমা নাই, আত্মীয়স্বজন নাই, সহায়-সম্বল নাই। তার জন্য আমি কোনোদিন আফসোস করি নাই। আল্লাহপাক যাকে যা দেন তাই নিয়াই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমিও ছিলাম। কিন্তু যে-দিন লতিফার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল সে-দিন কী যে কষ্ট লাগল বলে আপনাকে বুঝাতে পারব না! সারা রাত শহরের পথে-পথে ঘূরলাম। জীবনে কোনোদিন নামাজ কাজ করি নাই—এই প্রথম এশার নামাজ কাজ করলাম। ফজরের নামাজ কাজ করলাম। এত দিন পরে বলতে লজ্জা লাগছে–আমার প্রায় মাথা-খারাপের মতো হয়ে গিয়েছিল। তোরকেলা মোক্তার সাহেবের বাসায় গেলাম! সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এইখানে আর থাকব না। বাজারে চালের আড়তে থাকব। মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, এখন যাবে কেন বাবা? মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কত কাজকর্ম। কাজকর্ম শেষ করে তারপর যাও।

আমি মিথ্যা কথা বলি না। প্রথম মিথ্যা বললাম। আমি বললাম, মা, সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমাকে আজই দোকানে গিয়ে উঠতে বলেছেন-উনি আমার মনিব-অন্নদাতা। ওনার কথা না রাখলে অন্যায় হবে। বিয়ের সময় আমি চলে আসব। কাজকর্মের কোনো অসুবিধা হবে না, মা।

সবার কাছ থেকেই বিদায় নিলাম। লতিফার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলাম না। সে যখন সামনে এসে দাঁড়াল তখন চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না।

লতিফা বলল, চলে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

কেন, আমরা কি কোনো দোষ করেছি?

ছি ছিং-দোষ করবে কেন?

আচ্ছা, যাওয়ার আগে এই ধাঁধাটা ভাঙায়ে দিয়ে যান-বলেন দেখি–

ছাই ছাড়া শোয় না;

লাথি ছাড়া ওঠে না। এই জিনিস কি?

জানি না লতিফা।

এত সহজ জিনিস পারলেন না। এটা হল কুকুর। আচ্ছা যান। দোষঘাট হলে ক্ষমা করে দিয়েন।

আমি আড়তে চলে আসলাম। রাত আটটার দিকে মোক্তার সাহেব লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি শোকার ঘরে চেয়ারে বসে ছিলেন। আমাকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হল। আমি খুবই অবাক হলাম। একটু ভয়ভয়ও করতে লাগল। তাকিয়ে দেখি মোক্তার সাহেবের স্ত্রী খাটে বসে আছেন। নিঃশব্দে কাঁদছেন। আমি কিছুই বুঝলাম না। বুক ধড়ফড় করতে লাগল। না জানি কী হয়েছে।

মোক্তার সাহেব বললেন, তোমাকে আমি পুত্রের মতো স্নেহ করেছি। তার বদলে তুমি এই করলে? দুধ দিয়ে কালসাপ পোষার কথা শুধু শুনেছি। আজ নিজের চোখে দেখলাম।

আমি মোক্তার সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, মা, আমি কিছুই বুঝতেছি না।

মোক্তার সাহেব চাপা স্বরে বললেন, বোকা সাজার দরকার নাই! বোকা সাজবা না। তুমি যা করেছ তা তুমি ভালোই জান। তুমি পথের কুকুরেরও অধম।

আমি বললাম, আমার কী অপরাধ দয়া করে বলেন।

মোক্তার সাহেব রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, মেথরপট্টিতে যে শুয়োর থাকে তুই তার চেয়েও অধম—তুই নর্দমার ময়লা। বলতে-বলতে তিনিও কেঁদে ফেললেন।

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, লতিফা সবই আমাদের বলেছে–কিছুই লুকায় নাই। এখন এই অপমান এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় লতিফার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া। তুমি তাতে রাজি আছ, না মেয়ের সর্বনাশ করে পালানোই তোমার ইচ্ছা?

আমি বললাম, মা, আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না। লতিফা কী বলেছে আমি জানি না। তবে আপনারা যা বলবেন-আমি তা-ই করব। আল্লাহপাক উপরে আছেন। তিনি সব জানেন, আমি কোনো অন্যায় করি নাই মা।

মোক্তার সাহেব চিৎকার করে বললেন, চুপ থাক, শুয়োরের বাচ্চা। চুপ থাক।

সেই রাতেই কাজী ডাকিয়ে বিয়ে পড়ানো হল। বাসর রাতে লতিফা বলল, আমি একটা অন্যায় করেছি।–আপনার সাথে যেন বিবাহ হয় এই জন্য বাবা-মাকে মিথ্যা বলেছি—আমার পেটে সন্তান আছে। বিরাট অপরাধ করেছি, আপনার কাছে ক্ষমা চাই।

আমি বললাম, লতিফা, আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম! তুমি আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাও।

আপনি ক্ষমা করলেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তা ছাড়া আমি তেমন বড় অপরাধ তো করি নাই! সামান্য মিথ্যা বলেছি। আপনাকে বিবাহ করার জন্য অনেক বড় অপরাধ করার জন্যও আমি তৈরি ছিলাম। আচ্ছা এখন বলেন এই ধাঁধাটির মানে কি–

আমার একটা পাখি আছে

যা দেই সে খায়।

কিছুতেই মরে না পাখি

জলে মারা যায়।

বুঝলেন ভাইসাহেব, আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। এই আনন্দের কোনো সীমা নাই! আমার মতো নাদান মানুষের জন্য আল্লাহপাক এত আনন্দ রেখে দিয়েছেন। আমি কল্পনাও করি নাই! আমি কত বার যে বললাম, আল্লাহপাক, আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি। আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি।

বিয়ের পর আমি শ্বশুরবাড়িতেই থেকে গেলাম। আমার এবং লতিফার বড় দুঃখের সময় কাটতে লাগল। শ্বশুরবাড়ির কেউ আমাদের দেখতে পারে না। খুবই খারাপ ব্যবহার করে। আমার শাশুড়ি দিন-রাত লতিফাকে অভিশাপ দেন-মর, মর, তুই মর।

আমার শ্বশুরসাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন, সকালবেলায় তুমি আমার সামনে আসবা না। সকালবেলায় তোমার মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায়।

শ্বশুরবাড়ির কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। তারা একসঙ্গে খেতে বসে। সেখানে আমার যাওয়া নিষেধ। সবার খাওয়াদাওয়া শেষ হলে লতিফা থালায় করে আমার জন্য ভাত নিয়ে আসে। সেই ভাত আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না।

লতিফা রোজ বলে, চল, অন্য কোথাও যাই গিয়া।

আমি চুপ করে থাকি। কই যাব বলেন? আমার কি যাওয়ার জায়গা আছে? যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। লতিফা খুব কান্নাকাটি করে।

একদিন খুব অপমানের মধ্যে পড়লাম। আমার শ্বশুরসাহেবের পাঞ্জাবির পকেট থেকে এক হাজার টাকা চুরি গেছে। তিনি আমারে ডেকে নিয়ে বললেন, এই যে দাড়িওয়ালা, তুমি কি আমার টাকা নিছ?

আমার চোখে পানি এসে গেল। এ কী অপমানের কথা! আমি দরিদ্র। আমার যাওয়ার জায়গা নাই-সবই সত্য, কিন্তু তাই বলে আমি কি চোর? ছিঃ ছিঃ।

শ্বশুরসাহেব বললেন, কথা বল না কেন? আমি বললাম, আমারে অপমান কইরেন না। যত ছোটই হই, আমি আপনার কন্যার স্বামী।

শ্বশুরসাহেব বললেন, চুপ। চোর আবার ধর্মের কথা বলে! লতিফা সেইদিন থেকে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিল। সে বলল-এই বাড়ির তাত সে মুখে দিবে না।

আমার শাশুড়ি বললেন, ঢং করিস না। এই বাড়ির ভাত ছাড়া তুই ভাত পাইবি কই?

দুই দিন দুই রাত গেল, লতিফা পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয় না। আমারে বলে, তুমি আমারে অন্য কোথাও নিয়া চল। দরকার হইলে গাছতলায় নিয়া চল। এই বাড়ির ভাত আমি মুখে দিব না।

আমি মহা বিপদে পড়লাম।

হাত উঠায়ে বললাম।–হেমাবৃন্দ। হে পাক পরোয়ারদিগার—তুমি ছাড়া আমি কার কাছে যাব? আমার দুঃখের কথা কারে বলব? কে আছে আমার? তুমি আমারে বিপদ থাইক্যা বাঁচাও।

আল্লাহপাক আমার প্রার্থনা শুনলেন।

ভোরবেলায় চালের আড়তে গিয়েছি। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমারে ডেকে বললেন, এই যে মৌলানা, আমার একটা উপকার করতে পারবে?

আমি বললাম, জ্বি জনাব, বলেন।

ময়মনসিংহ শহরে আমি নতুন বাড়ি করেছি। এখন থেকে ঐ বাড়িতে থাকব! সপ্তাহে-সপ্তাহে এইখানে আসব। নেত্রকোণায় আমার যে-বাড়ি আছে–তুমি কি এই বাড়িতে থাকতে পারবে? নেত্রকোণার বাড়ি আমি বিক্রি করতে চাই না। শুনলাম তুমি বিবাহ করেছি–তুমি এবং তোমার স্ত্রী দু জন মিলে থাক।

আমি বললাম, জনাব, আমি অবশ্যই থাকব।

তা হলে তুমি এক কাজ কর, আজকেই চলে আস।। একতলার কয়েকটা ঘর নিয়ে তুমি থাক। দোতলার ঘর তালাবন্ধ থাকুক।

জ্বি আচ্ছা! বাড়িটা শহর থেকে দূরে। তবে ভয়ের কিছু নেই, একজন দারোয়ান আছে। চরিশ ঘন্টা থাকবে। দারোয়ানের নাম বলরাম। ভালো লোক।।

জনাব আমি আজকেই উঠব।

সেইদিন বিকালেই সিদিক সাহেবের বাড়িতে গিয়া উঠলাম। বিরাট বাড়ি। বাড়ির নাম সরাজুবালা হাউস। হিন্দু বাড়ি ছিল। সিদ্দিক সাহেবের বাবা কিনে নিয়েছিলেন। আট ইঞ্চি ইটের দেয়ালে বাড়ির চারদিক ঘেরা। দোতলা পাকা দালান। বিরাট বড় বড় বারান্দা। দেয়ালের ভিতরে নানান জাতের গাছগাছড়া দিনের বেলায়ও অন্ধকার হয়ে থাকে।

আমি লতিফাকে বললাম, বাড়ি পছন্দ হয়েছে লতিফা?

লতিফা আনন্দে কেঁদে ফেলল। দুই দিন খাওয়াদাওয়া না-করায় লতিফার শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চোখ ছোট-ছোট, ঠোঁট কালচে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এই অবস্থাতেই সে রান্নাবান্না করল। অতি সামান্য আয়োজন। ভাত ডাল পেঁপে ভাজা! খেতে অমৃতের মতো লাগল ভাইসাহেব।

খাওয়াদাওয়ার পর দু জনে হাত ধরাধরি করে বাগানে হাঁটলাম। হাসবেন না ভাইসব, তখন আমাদের বয়স ছিল অল্প। মন ছিল অন্য রকম! হাঁটতে-হাঁটতে আমার মনে হল, এই দুনিয়াতে আল্লাহপাক আমার মতো সুখী মানুষ আর তৈরি করেন নাই। আনন্দে বারবার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল ভাই সাহেব!

ক্লান্ত হয়ে একসময় একটা লিচুগাছের নিচে আমরা বসলাম। লতিফ বলল, আমি যে মিথ্যা কথা বইলা আপনেরে বিবাহ করছি, এই জন্য কি আমার উপর রাগ করছেন?

আমি বললাম, না লতিফা। আমার মতো সুখী মানুষ নাই।

যদি সুখী হন তাহলে এই ধাঁধাটা পারেন কি না দেখেন। বলেন দেখি–

কাটলে বাঁচে, না-কাটলে মরে

এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে?

পারলাম না লতিফা ভালোমতো চিন্তা কইরা বলেন। এইটা পারা দরকার। খুব দরকার–

কাটলে বাঁচে, না-কাটলে মরে

এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে?

পারব না লতিফ। আমার বুদ্ধি কম।

এইটা হইল সন্তানের নাড়ি-কাটা। সন্তানের জন্মের পর নাড়ি কাটলে সন্তান বাঁচে। না-কাটলে বাঁচে না। আচ্ছা এই ধাঁধাটি আপনেরে কোন জিজ্ঞেস করলাম বলেন তো?

তুমি বল। আমার বিচারবুদ্ধি খুবই কম।

এইটা আপনেরে বললাম—কারণ আমার সন্তান হবে!

লতিফা লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কী যে আনন্দ আমার হল ভাইসাহেব-কী যে আনন্দ!

সেই রাতে লতিফার জ্বর আসল।

বেশ ভালো জ্বর। আমি জ্বরের খবর রাখি না! ঘুমাচ্ছি। লতিফা আমারে ডেকে তুলল। বলল, আমার খুব ভয় লাগতেছে, একটু উঠেন তো।

আমি উঠলাম। ঘর অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। হারিকেন জ্বালায়ে শুয়েছিলাম। বাতাসে নিতে গেছে। হারিকেন জ্বালালাম।

তাকিয়ে দেখি লতিফার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বলল, ছাদের কার্নিশে কে যেন হাঁটে।

আমি শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনলাম না।

লতিফা বলল, আমি স্পষ্ট শুনেছি। একবার না, অনেক বার শুনেছি। জুতা পায়ে দিয়া হাঁটে। জুতার শব্দ হয়। হাঁটার শব্দ হয়।

বোধহয় দারোয়ান!

না, দারোয়ান না। অন্য কেউ।

কি করে বুঝলা অন্য কেউ?

বললাম না জুতার শব্দ! দারোয়ান কি জুতা পরে?

তুমি থাক। আমি খোঁজ নিয়া আসি?

না না। এইখানে একা থাকলে আমি মরে যাব।

আমি লতিফার হাত ধরে বসে রইলাম। এই প্রথম বুঝলাম লতিফার খুব জ্বর। জ্বর আরো বাড়ল। একসময় জ্বর নিয়ে ঘুমায়ে পড়ল। তখন আমি নিজেই শব্দটা শুনলাম। ঝন ঝন শব্দ। জুতার শব্দ না। অন্য রকম শব্দ। ঝন-ঝন ঝনঝন।

একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লাম।

তিন বার আয়াতুল কুরসি পড়ে হাততালি দিলে-সেই হাততালির শব্দ যতদূর যায় ততদূর কোনো জিন-ভূত আসে না। হাততালি দেয়ার পর ঝনঝন শব্দ কমে গেল, তবে পুরোপুরি গেল না। আমি সারা রাত জেগে কাটালাম।

ভোরবেলা সব স্বাভাবিক।

রাতে যে এত ভয় পেয়েছিলাম মনেই রইল না। লতিফার গায়েও জ্বর নেই। সে ঘর-দুয়ার গোছাতে শুরু করল। একতলার সর্বদক্ষিণের দুটো ঘর আমরা নিয়েছি। বারান্দা আছে। কাছেই কলঘর। লতিফা নিজের সংসার ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দারোয়ান বলরাম সাহায্য করার জন্য চলে আসল। বলরামের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। আদি বাড়ি নেপালে। দশ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসেছে, আর ফিরে যায় নি। এখন পুরোপুরি বাঙালি। বাঙালি একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সে মেয়ে মরে গেছে। বলরামের এক ছেলে আছে। খুলনার এক ব্যাঙ্কের দারোয়ান। ছেলে বিয়ে-শাদি করেছে। বাবার কোনো খোঁজখবর করে না।

বলরামের সঙ্গে অতি অল্প সময়ে লতিফার ভাব। বলরাম লতিফাকে মা ডাকা শুরু করল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দোকানে চলে গেলাম। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল!

বাড়িতে ঢুকে দেখি বারান্দায় পা ছড়িয়ে লতিফা বসে আছে। তার মুখ শুকনা। আমি বললাম, কী হয়েছে?

ভয় লাগছে!

কিসের ভয়?

বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

কী স্বপ্ন?

দেখলাম আমি ঘুমাচ্ছি। একটা লম্বা, কালো এবং খুব মোটা লোক ঘরে ঢুকল। লোকটার সারা শরীরে বড়-বড় লোম। কোনো দাঁত নেই। চোখগুলা অসম্ভব ছোটছোট। দেখাই যায়ন—এ-রকুম। হাতের থাবাগুলিও খুব ছোট। বাচ্চা ছেলেদের মতো। আমি লোকটাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। সে বলল, এই, ভয় পাস কেন? আমার নাম কফিল। আমি তো তোর সাথেই থাকি। তুই টের পাস না? তুই বিয়ে করেছিস, আমি কিছু বলি নাই। এখন আবার সন্তান হবে। ভালোমতো শুনে রাখ–তোর সন্তানটারে আমি শেষ করে দিব! এখনি শেষ করতাম। এখন শেষ করলে তোর ক্ষতি হবে। এইজন্য কিছু করছি না। সন্তান জন্মের সাত দিনের ভিতর আমি তারে শেষ করব। এই বলেই সে আমারে ধরতে আসল। আমি চিৎকার করে জেগে উঠলাম। তারপর থেকে এইখানে বসে আছি।

আমি বললাম, স্বপ্ন হল স্বপ্ন। কত খারাপ-খারাপ স্বপ্ন মানুষ দেখে। সবচেয়ে বেশি খারাপ স্বপ্ন দেখে পোয়াতি মেয়েছেলে। তাদের মনে থাকে মৃত্যুভয়।

কথাবার্তা বলে লতিফাকে মোটামুটি স্বাভাবিক করে তুললাম। সে ঘরের কাজকর্ম করতে লাগল। রান্না করল। আমরা সকাল-সকাল খাওয়াদাওয়া করলাম। তারপর বাগানে হাঁটতে বের হলাম। লতিফা বলল, এই বাড়িতে একটা দোষ আছে, সেইটা কি আপনি জানেন?

কী দোষ?

এই বাড়িতে একটা খারাপ কুয়া আছে। সিদ্দিক সাহেবের চার বছর বয়সের একটা ছোট্ট মেয়ে কুয়ায় পড়ে মারা গিয়েছিল। কুয়াটা দোষী।

কী যে তুমি বল! কুয়া দোষী হবে কেন? বাচ্চা মেয়ে খেলতে-খেলতে পড়ে গেছে।

তা না, কুয়াটা আসলেই দোষী।

কে বলেছে?

বলরাম বলেছে। কুয়াটার মুখ সিদ্দিক সাহেব টিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেই টিনে রাতের বেলা কানঝন শব্দ হয়। মনে হয় ছোট কোনো বাচ্চা টিনের উপরে লাফায়। তুমি গত রাতে কোনো ঝন ঝন শব্দ শোনা নাই?

আমি মিথ্যা করে বললাম, না।

আমি কিন্তু শুনেছি।

আমি বলরামের উপর খুব বিরক্ত হলাম। এইসব গল্প বলে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয়? ঠিক করলাম, ভোরবেলায় তাকে ডেকে শক্তভাবে ধমক দিয়ে দেব।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময়ে লক্ষ করলাম, লতিফার জ্বর এসেছে। সে কেমন ঝিম মেরে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুতে গেলাম। গভীর রাতে ঘুম ভাঙিল। লতিফা আমাকে ঝাঁকাচ্ছে। ঘর অন্ধকার। লতিফা বলল, হারিকেন আপনা-আপনি নিভে গেছে। আমার বড়ো ভয় লাগতেছে।

আমি হারিকেন জ্বালালাম, আর তখনি ঝন ঝন শব্দ পেলাম। একবার না, বেশ কয়েক বার।

লতিফা ফিসফিস করে বলল, শব্দ শুনলেন?

আমি জবাব দিলাম না। লতিফা কাঁদতে লাগল।

যতই দিন যেতে লাগল লতিফার অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগল। রোজ সে কফিলিকে স্বপ্ন দেখে। কফিল তাকে শাসিয়ে যায়। বারবার মনে করিয়ে দেয়—বাচ্চা হওয়ার সাত দিনের মধ্যে সে বাচ্চা নিয়ে নিবে। মনের শান্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল।

আমি লতিফাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলাম, সে রাজি হল না। প্রয়োজনে সে এইখানেই মরবে, কিন্তু বাবার বাড়িতে যাবেনা। আমি তার জন্য তাবিজকবীচের ব্যবস্থা

করলাম, বাড়ি-বন্ধনের ব্যবস্থা করলাম! আমি দরিদ্র মানুষ, তবু একটা কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করলাম, যেন সে সারাক্ষণ লতিফার সঙ্গে থাকে।

কিছুতেই কিছু হল না।

এক সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে দেখি-লতিফা খুব সাজগোজ করেছে। লাল একটা শাড়ি পরেছে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে। বেণী করে চুল বেঁধেছে। বেণীতে চারপাঁচটা জবা ফুল। সে পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে। একটু দূরে বলরাম এবং কাজের মেয়েটা। তারা দু জন ভীত চোখে তাকিয়ে আছে লতিফার দিকে।

আমাকে দেখেই লতিফা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। আমি বললাম, কী হয়েছে লতিফা? লতিফা হাসি থামাল এবং আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে পুরুষের গলায় বলল, মৌলানা আসছে। মৌলানারে অজুর পানি দেও! নামাজের পাটি দেও। কেবলা কোন দিকে দেখাইয়া দেও! টুপি দেও, তসবি দেও!

আমি বললাম, এই রকম করতেছ। কেন লতিফা?

লতিফা আবার হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ে বলল, ওমা, মেয়েছেলের সঙ্গে দেখি মৌলানা কথা বলে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মৌলানার লজ্জা নাই!

আমি আয়তুল কুরসি পড়া শুরু করলাম।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে লতিফা চিৎকার করে বলল, চুপ কর। আমার নাম কফিল! তোর মতো মৌলানা আমি দশটা হজম কইরা রাখছি। গোটা কোরান শরিফ আমার মুখস্থ।

আমার সঙ্গে পাল্লা দিবি? আয়, পাল্লা দিলে আয়। প্রথম থাইকা শুরু করি. হি-হিঁ-হি ভয় পাইছস? ভয় পাওনেরই কথা। বেশি ভয় পাওনের দরকার নাই। তোরে আমি কিছু বলব না! তোর বাচ্চাটারে শেষ করব। তুই মৌলানা মানুষ, তুই বাচ্চা দিয়া কী করবি? তুই থাকিবি মসজিদে। মসজিদে বইস্যা তুই তোর আল্লাহরে ডাকবি। পুলাপান না-থাকাই তোর জন্য ভাোলা। হি-হি-হি।

একটা ভয়ংকর রাত পার করলাম ভাইসাব। সকালে দেখি সব ঠিকঠাক। লতিফ ঘরের কাজকর্ম করছে। এইভাবে দিন পার করতে লাগিলাম। কখনো ভালো কখনো মন্দ।

লতিফ যখন আট মাসের পোয়াতি, তখন আমি হাতে-পায়ে ধরে আমার শাশুড়িকে এই বাড়িতে নিয়া আসলাম। লতিফা খানিকটা শান্ত হল। তবে আগের মতো সহজ-স্বাভাবিক হল না। চমকে-চমকে ওঠে। রাতে ঘুমাতে পারে না। ছটফট করে। মাঝে-মাঝে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই দুঃস্বপ্নে কফিল এসে উপস্থিত হয়। কফিল চুপা গলায় বলে, দেরি নাই—আরদেরি নাই। পুত্রসন্তান আসতেছে। সাতদিনের মধ্যে নিয়ে যাব। কান্দাাকোটি যা করার কইরা নেও। ঘুম ভেঙে লতিফা জেগে ওঠে। চিৎকার করে কাঁদে। আমি চোখে দেখি অন্ধকার। কী করব কিছুই বুঝি না।

শ্রাবণ মাসের তিন তারিখে লতিফার একটা পুত্রসন্তান হল। কী সুন্দর যে ছেলেটা হল ভাইসাহেব, না-দেখলে বিশ্বাস করবেন না। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ। টানাটানা চোখ। আমি এক শ রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ে আল্লাহ্র কাছে আমার সন্তানের হায়াত চাইলাম। আমার মনের অস্থিরতা কমল না।

আঁতুড়ঘরের বাইরে একটা বেঞ্চ পেতে রাতে শুয়ে থাকি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন আমার শাশুড়ি আর আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের এক খালাতো বোন। পালা করে কেউ-না-কেউ সারা রাত জেগে থাকি।

লতিফার চোখে এক ফোটাও ঘুম নাই। সন্তানের মা। সারাক্ষণ বাচ্চা বুকের নিচে আড়াল করে রাখে। এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করে না। আমার শাশুড়ি যখন বাচ্চা কোলে নেন। তখনো লতিফ বাচ্চাটার গায়ে হাত দিয়ে রাখে, যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

ছয় দিনের দিন কি হল শুনেন।

ঘোর বর্ষ। সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যার পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। এ-রকম বর্ষা আমি আমার জীবনে দেখি নাই।

লতিফা আমাকে বললো, আইজরাইতটা আপনে জাগনা থাকবেন। আমার কেমন জানি লাগতেছে।

আমি বললাম, কেমন লাগতেছে?

জানি না। একটু পরে-পরে শরীর কাঁপতেছে।

তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। আমি সারা রাইত জগনা থাকব।

আপনে একটু বলরামরেও খবর দেন। সেও যেন জগন্না থাকে।

আমি বলরামকে খবর দিলাম। লতিফ বাচ্চাটারে বুকের নিচে নিয়া শুইয়া আছে। আমি একমনে আল্লাহপাকেরে ডাকতেছি। জীবন দেওয়ার মালিক তিনি। জীবন নেওয়ার মালিকও তিনি।

রাত তখন কত আমি জানি না ভাইসাহেব। ঘুমায়ে পড়েছিলাম। লতিফার চিৎকারে ঘুম ভাঙিল। সে আসমান ফাটাইয়া চিৎকার করতেছে। আমার বাচ্চা কই গেল-আমার বাচ্চা কই। হারিকেন জ্বালানো ছিল, নিভানো! পুরা বাড়ি অন্ধকার। কাঁপতে-কাঁপতে হারিকেন জ্বালালাম। দেখি সত্যি বাচ্চা নাই। আমার শাশুড়ি ফিট হয়ে পড়ে গেলেন।

লতিফা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ছুটে গেল কুয়ার কুয়ার উপর টিন দিয়া ঢাকা ছিল। তাকায়ে দেখি টিন সরানো। লতিফা চিৎকার করে বলছে—আমার বাচ্চারে কুয়ার ভিতর ফালাইয়া দিছে। আমার বাচ্চা কুয়ার ভিতরে। লতিফা লাফ দিয়া কুয়াতে নামতে চাইল। আমি তাকে জড়ায়ে ধরলাম।

ইমাম সাহের চুপ করে গেলেন। কপালের ঘাম মুছলেন।

আমি বললাম, বাচ্চাটা কি সত্যি কুয়াতে ছিল?

জ্বি।

আর দ্বিতীয় বাচ্চা? সে-ও কি এইভাবে মারা যায়?

জ্বি-না জনাব। আমার দ্বিতীয় বাচ্চা শ্বশুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করে।

সিদ্দিক সাহেবের ঐ বাড়ি তাহলে আপনি ছেড়ে দেন?

জ্বি। তাতে অবশ্য লাভ হয় না। কফিলের যন্ত্রণা কমে না। দ্বিতীয় সন্তানটাকেও সে মারে। জন্মের চারদিনের দিন–

আমি আৎকে উঠে বললাম, থাক ভাই, আমি শুনতে চাই না। গল্পগুলো আমি সহ্য করতে পারছি না।

ইমাম সাহেব বললেন, আল্লাহপাক আরেকটা সন্তান দিতেছেন। কিন্তু এই সন্তানটাকেও বাঁচাতে পারব না। মনটা বড়ই খারাপ ভাই সাহেব। বড়ই খারাপ। আমি কত বার চিৎকার করে বলেছি-কফিল, তুমি আমারে মেরে ফেল। আমার সন্তানরে মের না। এই সুন্দর দুনিয়া তারে দেখতে দাও।

ইমাম সাহেব কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হল! ইমাম সাহেব ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সেইদিন ভোরেই আমি সফিককে নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম। সফিকের আরো কিছুদিন থেকে কালু খাঁর রহস্য ভেদ করে আসার ইচ্ছা ছিল। আমি তা হতে দিলাম না। ইমাম সাহেবের সঙ্গে আরো কিছু সময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

.

৩.

সাধারণত আমি আমার জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র বলি। মজার ব্যাপার হচ্ছে—ইমাম সাহেরের এই গল্প তাঁকে বলা হল না!

ঢাকায় ফেরার তিন দিনের মাথায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা নানান কথাবার্তা হল-এটা বাদ পড়ে গেল।

দু, মাস পর মিসির আলি আমার বাসায় এলেন। রাতে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম। তিনি প্রায় দু ঘন্টা কাটিয়ে বাড়ি চলে গেলেন—ইমাম সাহেবের গল্প বলা হল না। তিনি চলে যাবার পর মনে হল–ইমাম সাহেবের গল্পটা তো তাঁকে শোনানো হল না।

আমি আমার মেয়েকে বলে রাখলাম যে এর পরে যদি কখনো মিসির আলি সাহেব আমাদের বাসায় আসেন, সে যেন আমার কানের কাছে ইমাম বলে একটা চিৎকার দেয়। আমার এই মেয়ের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। সে যে যথাসময়ে ইমাম বলে চিৎকার দেবে, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

হলও তাই। অনেকদিন পর মিসির আলি সাহেব এসেছেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করছি।—আমার মেয়ে কানের কাছে এসে বিকট চিৎকার দিল। এমন চিৎকার যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল! মেয়েকে কড়া ধমক দিলাম। মেয়ে কাদো-কাদো হয়ে বলল, তুমি তো বলেছিলে মিসির চাচু এলে-ইমাম বলে চিৎৎকার করতো।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে তো বলি নি। যাও, এখন যাও তো!

মিসির আলি বললেন, ব্যাপারটা কী?

আমি বললাম, তেমন কিছু না। আপনাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম। একজন ইমাম সাহেবের গল্প। আপনার সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু গল্পটা বলার কথা মনে থাকে না! মেয়েকে মনে করিয়ে দিতে বলেছি। সে এমন চিৎকার দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে বা কানে কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

মিসির আলি বললেন, গল্পটা কী বলুন শুনি।

আজ থাক। আরেক দিন বলব। একটু সময় লাগবে। লম্বা গল্প।

মিসির আলি বললেন, আরেক কাপ চা দিতে বলুন। চা খেয়ে বিদেয় হই।

চায়ের কথা বলে মিসির আলির সামনে এসে বসলাম। মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, ইমাম সাহেবের গল্পটা। আপনি আমাকে কখনই বলতে পারবেন না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

আপনার মস্তিষ্কের একটা অংশ আপনাকে গল্পটা বলতে বাধা দিচ্ছে, যেকারণে অনেক দিন থেকেই আপনি আমাকে গল্পটা বলতে চান। অথচ বলা হয় না। আপনার মনে থাকে না। আজ। আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া হল, এবং মনেও করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি রেগে গেলেন। তার চেয়ে বড় কথা মনে করিয়ে দেবার পরেও আপুনি গল্পটি বলতে চাচ্ছেন না। অজুহাত বের করেছেন-বলছেন, লম্বা গল্প। আমি নিশ্চিত, আপনার অবচেতন মন চাচ্ছে না। এই গল্প আপনি আমাকে বলেন। আপনার সাবকনশ্যাস মাইন্ড আপনাকে বাধা দিচ্ছে!

আমার সাবকনশ্যাস মাইন্ড আমাকে বাধা দিচ্ছে কেন?

আমি তা বুঝতে পারছি না। গল্পটা শুনলে বুঝতে পারব। চা আসুক। চা খেতে— খেতে আপনি বলা শুরু করুন। আমার সিগারেটও ফুরিয়েছে। কাউকে দিয়ে কয়েকটা সিগারেট আনিয়ে দিন।

আমি আর কোনো অজুহাতে গেলাম না। গল্প শেষ করলাম। গল্প শেষ হওয়ামাত্র মিসির আলি বললেন, আবার বলুন।

আবার কেন?

মানুষ যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প বলে তখন মূল গল্পটি দ্রুত বলার দিকে ঝোঁক থাকে বেশি। গল্পের ডিটেইলস-এ যেতে চায় না। একই গল্প দ্বিতীয় বার বলার সময় বর্ণনা বেশি থাকে। কারণ মূল কাহিনী বলা হয়ে গেছে। কথক তখন নাবলা অংশ বলতে চেষ্টা করেন। আপনিও তাই করবেন। প্রথম বার শুনে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারি নি। দ্বিতীয় বারে বুঝতে পারব। শুরু করুন।

আমি শুরু করলাম, বেশ সময় নিয়ে বললাম।

মিসির আলি বললেন, কবে গিয়েছিলেন ধুন্দুল নাড়া? তারিখ মনে আছে?

আছে।

আমি মিসির আলিকে তারিখ বললাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, আপনার তারিখ অনুযায়ী মেয়েটির বাচ্চা এখন হবে কিংবা হয়ে গেছে। আপনি বলছেন। দশ মাস আগের কথা। মেয়েটির বাচ্চা হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে যে হত্যা করা হয়েছে। সেই সম্ভাবনা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি। আর যদি এখনো হয়ে না থাকে তাহলে বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেতে পারে। এখন কটা বাজে দেখুন তো।

আমি ঘড়ি দেখলাম, নটা বাজে।

মিসির আলি বললেন, রাত সাড়ে দশটায় ময়মনসিংহে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। চলুন রওনা হই।

সত্যি যেতে চান?

অবশ্যই যেতে চাই। আপনার অসুবিধা থাকলে কীভাবে যেতে হবে আমাকে বলে দিন। আমি ঘুরে আসি।

আমার অসুবিধা আছে। তবু যাব। এখন বলুন তো জিন কফিলের ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করছেন?

না।

আপনার ধারণা বাচ্চাগুলোকে খুন করা হয়েছে?

তা তো বটেই।

কে খুন করেছে?

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, কে খুন করেছে তা আপনিও জানেন। আপনার সাবকনশ্যাস মাইন্ড জানে। জানে বলেই সাবকনশ্যাস মাইন্ড গল্পটি বলতে আপনাকে বাধা দিচ্ছিল।

আমি কিছুই জানি না।

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, আপনার সাবকনশ্যাস মাইন্ড জানে, কিন্তু সে এটি আপনার কনশ্যাস মাইন্ডকে জানায় নি বলেই আপনার মনে হচ্ছে আপনি জানেন না।

আমি বললাম, কে খুন করেছে?

লুতফা। দুটি বাচ্চাই সে মেরেছে। তৃতীয়টিও মারবে।

কী বলছেন এ-সব!

চলুন, রওনা হয়ে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। টেনে যেতে-যেতে ব্যাখ্যা করব।

মিসির আলি বললেন, লতিফা যে পুরো ঘটনাটা ঘটাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় শুরুতেই, যখন ইমাম সাহেব আপনাকে বলেন। কীভাবে জিন কফিল তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল।...

পুরোনো ধরনের মসজিদ-একটামাত্র দরজা। এই ধরনের মসজিদে বসে থাকলে বাইরের চিৎকার শোনা যাবে না, ভেতর থেকে চিৎকার করলেও বাইরের কেউ শুনবে না। কারণ সাউন্ড ওয়েভ চলার জন্যে মাধ্যম লাগে। মসজিদের দেয়াল সেখানে বাধার মতো কাজ করছে।...

আপনি এবং ইমাম সাহেব মসজিদে ছিলেন। ইমাম সাহেব একসময় স্ত্রীর খোঁজ নিতে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন—লতিফা খুব চিৎকার করছে। তাই না?

জ্বি, তাই?

মসজিদের ভেতরে বলে সেই চিৎকার আদম শুনতে পাননি। তাই না?

জ্বি।

অথচ ইমাম সাহেব যখন আগুন দেখে ভয়ে চোঁচালেন, বাঁচাও বাঁচাও-তখন লতিফা পানির বালতি নিয়ে ছুটে এল। প্রথমত ইমাম সাহেবের চিৎকার লতিফার শোনার কথা নয়। দ্বিতীয়ত শুনে থাকলেও লতিফা কী করে বুঝল আগুন লেগেছে? সে পানির বালতি নিয়ে ছুটে এল কেন? আগুন-আগুন বলে চিৎকার করলেও আমরা চিৎকার শুনে প্রথমে খালি হাতে ছুটে আসি, তারপর পানির বালতি আনি। এটাই স্বাভাবিক। এই মেয়েটি শুরুতেই পানির বালতি নিয়ে ছুটে এসেছে। কারণ পানির বালতি হাতের কাছে রেখেই সে আগুন ধরিয়েছে। আমার এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?

হচ্ছে।

প্রথম শিশুটি মারা গেল। শিশুটিকে ফেলা হল কুয়ায়। এই খবর মেয়েটি জানে, কারণ সে পাগলের মতো ছুটে গেছে কুয়ার দিকে—অন্য কোথাও নয়। তার বাচ্চাটিকে কুয়াতে ফেলা হয়েছে, এটা সে জানল কীভাবে? জানল, কারণ সে নিজেই ফেলেছে। এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, হচ্ছে? আপনাকে কি আরো যুক্তি দিতে হবে? আমার কাছে আরো ছোটখাটো যুক্তি আছে।

আর লাগবে না। শুধু বলুন-কুয়ার ওপরের টিনে ঝন ঝন শব্দ হত কেন? যে-শব্দ ইমাম সাহব নিজেও শুনেছেন?

কুয়ার টিনটা না-দেখে বলতে পারব না। আমার ধারণা বাতাসে টিনটা কাঁপে, ঝন ঝন শব্দ হয়। দিনের বেলায় এই শব্দ শোনা যায় না, কারণ আশেপাশে অনেক ধরনের শব্দ হতে থাকে। রাত যতই গভীর হয় চারপাশ নীরব হতে থাকে। সামান্য শব্দই বড় হয়ে কানে আসে।

আপনার এই যুক্তিও গ্রহণ করলাম, এখন বলুন, লতিফা এমন ভয়ংকর কাণ্ড কেন করছে?

মেয়েটা অসুস্থ। মনোবিকার ঘটেছে। ইমাম সাহেব লোকটি তাদের আশ্রিত। তাদের পরিবারে চাকরিবাকাররা যে-কাজ করে, সে তাই করত। মেয়েটি ভাগ্যের পরিহাসে এমন একজন মানুষের প্রেমে পড়ে যায়। প্রচণ্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। পরিবারের সবার কাছে ছোট হয়, অপমানিত হয়। এত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। তার মনোবিকার ঘটে। পোয়াতি অবস্থায় মেয়েদের হরমোনাল ব্যালান্স এদিক-ওদিক হয়। সেই

সময় মনোবিকার তীব্র হয়। মেয়েটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মেয়েটি দরিদ্র ইমামকে বিয়ে করে কঠিন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। একই সঙ্গে সে লোকটিকে প্রচণ্ড ভালবাসে, আবার প্রচণ্ড ঘৃণাও করে। কী ভয়াবহ অবস্থা।

মেয়েটি ইমামকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে, এটা কেন বলছেন?

ইমামতি পেশা মেয়েটির পছন্দ নয়। পছন্দ নয় বলেই মেয়েটি কফিলের গলায় বলেছে- ইমাম আসছে। অজুর পানি দে, জয়নামাজ দে, কেবলা কোন দিকে বলে দে। একধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করছে।

মনোবিকার এমন ভয়াবহ রূপ নিল কেন? সে নিজের বাচ্চাকে হত্যা করছে কেন?

বড়ো ধরনের বিকারে এ-রকম হয়। সে নিজেকে ধ্বংস করতে চাইছে। নিজের সন্তানহত্যার মাধ্যমে সেই ইচ্ছারই অংশবিশেষ পূর্ণ হচ্ছে। আরো কিছু থাকতে পারে। না দেখে বলতে পারব না।

.

৪.

ধুন্দুল নাড়া গ্রামে সন্ধ্যার পর পৌঁছলাম। পৌঁছেই খবর পেলাম পাঁচ দিন হয় ইমাম সাহেবের একটি কন্যা হয়েছে। কন্যাটি ভালো আছে। বড় ধরনের স্বস্তি বোধ করলাম।

ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম মসজিদে। তিনি আমাদের দেখে বড়ই অবাক হলেন। আমি বললাম, আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, ভালো না। খুব খারাপ। কফিল তার সঙ্গে-সঙ্গে আছে। কফিল বলেছে, সাতদিনের মাথায় মেয়েটিকে মেরে ফেলবে। খুব কষ্টে আছি ভাইসাহেব। আল্লাহপাকের কাছে আমার জন্য খাস দিলে একটু দোয়া করবেন। আমি বললাম, আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। উনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা বলবেন।

ইমাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

যাতে আপনার বাচ্চাটা ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। উনি খুব বড় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। অনেক কিছু বুঝতে পারেন, যা আমরা বুঝতে পারি না। ওনার কথা শুনলে আপনাদের মঙ্গল হবে। এই জন্যেই ওনাকে এনেছি।

অবশ্যই আমি ওনার কথা শুনব। অবশ্যই শুনব।

ইমাম সাহেব আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে অনেক লোকজন ছিল, তাদের সরিয়ে দেওয়া হল।

মিসির আলি বললেন, আমি কিছু কথা বলব যা শুনতে ভালো লাগবে না, তবু দয়া করে শুনুন।

লতিফা চাপা গলায় বলল, আমার সাথে কী কথা? আপনার বাচ্চাটির বিষয়ে কথা। বাচ্চাটি যাতে বেঁচে থাকে, ভালো থাকে, সেজন্যেই আমার কথাগুলি আপনাকে শুনতে হবে।

লতিফা তার স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, বলেন, কী বলবেন।

মিসির আলি খুবই নিরাসক্ত গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। কথা বলার সময় একবারও লতিফার দিকে তাকালেন না। লতিফা তার শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় লম্বা ঘোমটা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে তার তীব্র চোখের দৃষ্টি নজরে আসছে। ইমাম সাহেব তাঁর স্ত্রীর পাশে বসে আছেন। মিসির আলির ব্যাখ্যা যতই শুনছেন ততই তাঁর চেহারা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

মিসির আলি কথা শেষ করে লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি আমার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলেন?

লতিফা জবাব দিল না। মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিল। কী সুন্দর শান্ত মুখ! চোখের তীব্রতা এখন আর নেই। মনে হচ্ছে অশ্রু টলমল করছে।

মিসির আলি কঠিন গলায় বললেন, আমার ব্যাখ্যা আপনি বিশ্বাস না-করলেও শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মঙ্গলের জন্যে শিশুটিকে আপনি অন্যের কাছে দিন। সে যেন কিছুতেই আপনার সঙ্গে না থাকে। আমার যা বলবার বললাম, বাকিটা আপনাদের ব্যাপার। আচ্ছা, আজ তাহলে যাই। আমরা রাতেই রওনা হব। নৌকা ঠিক করা আছে।

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, মিসির আলি সাহেব, আপনার কি মনে হয় মেয়েটি আপনার কথা বিশ্বাস করেছে?

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, হ্যাঁ, করেছে। এবং বিশ্বাস করার কারণেই তার দ্রুত রোগমুক্তি ঘটবে। আমার ধারণা, মেয়েটি নিজেও খানিকটা হলেও এই সন্দেহই করছিল। মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী। চলুন, রওনা দেওয়া যাক। এই গ্রামে রাত কাটাতে চাই না।

আমি বললাম, ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে যাবেন না?

না। আমার কাজ শেষ, বাকিটা ওরা দেখবে।

রওনা হবার আগে ইমাম সাহেব। ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। শিশুটি তাঁর কোলে। তিনি বললেন, লতিফা মেয়েটাকে দিয়ে দিয়েছে। সে খুব কাঁদতেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মেহেরবানি করে একটু আসেন।

আমরা আবার ঢুকলাম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, লতিফা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, আপনি কি কিছু বলবেন?

লতিফা কাঁদতে-কাঁদতে বলল, আল্লাহ আপনার ভালো করবে। আল্লাহ্ আপনার ভালো করবে।

আপনি কোনো রকম চিন্তা করবেন না। আপনার অসুখ সেরে গেছে। আর কোনো দিন হবে না।

লতিফা তার স্বামীর কানো-কানে কী যেন বলল! ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, জনাব, কিছু মনে করবেন না। লতিফা আপনারে একটু ছুঁইয়া দেখতে চায়।

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন। লতিফা দু'হাতে সেই হাত জড়িয়ে ধরে শিশুর মত চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

নৌকায় উঠছি।

ইমাম সাহেব আমাদের তুলে দিতে এলেন। নৌকা ছাড়ার আগ-মুহূর্তে নিচু গলায় বললেন, ভাইসাহেব, আমি অতি দরিদ্র মানুষ, আপনাদের যে কিছু দিব আল্লাহ্পাক আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই। এই কোরান শরিফটা আমার দীর্ঘ দিনের সঙ্গী। যখন মন খুব খারাপ হয় তখন পড়ি-মন শান্ত করি। আমি খুব খুশি হব। যদি কোরান মজিদটি আপনি নেন। আপনি নিবেন কি না তা অবশ্য জানি না।

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই নেব। খুব আনন্দের সঙ্গে নেব। ভাইসাহেব, আমার মেয়েটার একটা নাম কি আপনি রাইখা যাইবেন? মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ, যাব। আপনার মেয়ের নাম রাখলাম লাবণ্য। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এই নামের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েটা আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয় নি। মাঝেমাঝেই মেয়েটার কথা আমার মনে হয়। মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভাই, যাই।

মিসির আলি বললেন, গল্প শুনবেন নাকি?

আমি ঘড়ির দিকে তাকলাম। রাত মন্দ হয় নি। দশটার মতো বাজে। বাসায়

ফেরা দরকার। আকাশের অবস্থাও ভালো না। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। আষাঢ় মাস।

যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

আমি বললাম, আজ থাক, আরেক দিন শুনব। রাত অনেক হয়েছে। বাসায় চিন্তা করবে।

মিসির আলি হেসে ফেললেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, হাসছেন কেন?

মিসির আলি হাসাতে-হাসতেই বললেন, বাসায় কে চিন্তা করবে? আপনার স্ত্রী কি বাসায় আছেন? আমার তো ধারণা তিনি রাগ করে বাচ্চাদের নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন।

মিসির আলির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সামান্য সূত্র ধরে সিদ্ধান্তে চলে যাবার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে আমি পরিচিত। তবুও বিস্মিত হলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ দুপুরেই বড় ধরনের ঝগড়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় সে সুটকেস গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেছে। এক-একা খালি বাড়িতে থাকতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল বলে মিসির আলির কাছে এসেছি, তবে এই ঘটনার কিছুই বলি নি। আগ বাড়িয়ে পারিবারিক ঝগড়ার কথা বলে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।

আমি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললাম, ঝগড়া হয়েছে বুঝলেন কী করে?

অনুমানে বলছি।

অনুমানটাই-বা কী করে করলেন?

আমি লক্ষ করলাম, আপনি আমার কাছে কোনো কাজে আসেন নি। সময় কাটাতে এসেছেন। গল্প করছেন এবং আমার গল্প শুনছেন। কোনো কিছুতেই তেমন আনন্দ পাচ্ছেন না। অর্থাৎ কোনো কারণে মন বিক্ষিপ্ত। আমি বললাম, ভাবি কেমন আছেন? আপনি বললেন, ভালো! কিন্তু বলার সময় আপনার মুখ কঠিন হয়ে গেল। অর্থাৎ ভাবির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি তখন নিশ্চিত হবার জন্যে বললাম, আমার সঙ্গে চারটা ভাত খান। আপনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি ধরে নিলাম।–রাগারগি হয়েছে এবং আপনার স্ত্রী বাসায় নেই। আপনার এক-এক লাগছে বলেই আপনি এসেছেন আমার কাছে। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্যে শার্লক হোমস হতে হয় না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

আমি কিছু বললাম না। মিসির আলি বললেন, চা চড়াচ্ছি। চা খেয়ে গল্প শুনুন, তারপর এইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। খালি বাসায় এক-একা রাত কাটাতে ভালো লাগবে না। তা ছাড়া বৃষ্টি নামল বলে।

এটাও কি আপনার লজিক্যাল ডিডাকশান?

না—এটা হচ্ছে উইশফুল থিংকিং। গরমে কষ্ট পাচ্ছি–বৃষ্টি হলে জীবন বাঁচে। তবে বাতাস ভারি, বৃষ্টির দেরি নেই বলে আমার ধারণা।

বাতাসের আবার হালকা-ভারি কী?

আছে। হালকা-ভারির ব্যাপার আছে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় বাতাস হয় ভারি। সেটা আমি বুঝতে পারি মাথায় চুলে হাত দিয়ে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাথার চুল নরম বা শক্ত হয়। শীতকালে মাথার চুলে হাত

দিয়ে দেখবেন একরকম, আবার গরমকালে যখন বাতাসে হিউমিডিটি অনেক বেশি, তখন অন্যরকম।

আমার কাছে তো সবসময় একরকম লাগে।

মিসির আলি ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। ভাবটা এ-রকম, যেন এর চেয়ে মজার কথা আগে শোনেন নি। আমি বোকার মতো বসে রইলাম। অস্বস্তিও লাগতে লাগল। খুব বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে গল্প করার মধ্যেও একধরনের অস্বস্তি থাকে। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

মিসির আলি স্টোভে চায়ের পানি বসিয়ে দিলেন। শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। এই যুগে স্টোভ প্রায় চোখেই পড়ে না। মিসির আলি এই বস্তু কোথেকে জোগাড় করেছেন। কে জানে! কিছুক্ষণ পরপর পাম্প করতে হয়। অনেক যন্ত্রণা।

চায়ের কাপ হাতে বিছানায় এসে বসামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। তুমুল বর্ষণ। মিসির আলি বললেন, আমার বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কেন জানেন?

জানি না।

বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না-করণ সেখানে ঝড়-বৃষ্টি নেই। এয়ারকুলার বসানো একটা ঘরের মতো সেখানকার আবহাওয়া। তাপ বাড়বেও না, কমবেও না! অনন্ত কাল একই থাকবে। কোনো মানে হয়?

আপনি কি বেহেশত-দোজখ এইসব নিয়ে মাথা ঘামান?

না, ঘামাই না।

সৃস্টিকর্তা নিয়ে মাথা ঘামান? হ্যাঁ, ঘামাই। খুব চিন্তা করি, কোনো কুল-কিনারা পাই না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থ কী বলে, জানেন? বলে—সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর পারেন না এমন কিছুই নেই। তিনি সব পারেন। অথচ আমার ধারণা তিনি দুটো জিনিস পারেন না, যা মানুষ পারে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, উদাহরণ দিন।

সৃস্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না-মানুষ পারে। আবার সৃস্টিকর্তা দ্বিতীয় একজন সৃষ্টিকর্তা তৈরি করতে পারেন না। মানুষ কিন্তু পারে, সে সন্তানের জন্ম দেয়।

আপনি তাহলে একজন নাস্তিক?

না, আমি নাস্তিক না। আমি খুবই আস্তিক। আমি এমন সব রহস্যময় ঘটনা আমার চারপাশে ঘটতে দেখেছি যে বাধ্য হয়ে আমাকে অস্তিক হতে হয়েছে। ব্যাখ্যাতীত সব ঘটনা। যেমন স্বপ্নের কথাটাই ধরুন। সামান্য স্বপ্ন, অথচ ব্যাখ্যাতীত একটা ঘটনা।

ব্যাখ্যাতীত হবে কেন? ফ্রয়েড তো চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন বলে শুনেছি।

মোটেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেন নি। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটাই তিনি অবদমিত কামনার ওপর চাপিয়ে দিয়ে লিখলেন—Interpretations of dream। তিনি শুধু বিশেষ একধরনের স্বপ্নই ব্যাখ্যা করলেন। অন্য দিক সম্পর্কে চুপ করে রইলেন। যদিও তিনি খুব ভালো করে জানতেন মানুষের বেশ কিছু স্বপ্ন আছে, যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি এই

নিয়ে প্রচুর কাজও করেছেন, কিন্তু প্রকাশ করেন নি। নষ্ট করে ফেলেছেন! তাঁর ছাত্র প্রফেসর ইয়ুং কিছু কাজ করেছেন—মূল সমস্যায় পৌঁছতে পারেননি,বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কিছু-কিছু স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে তা বলা যাচ্ছে না। যেমন-একটা লোক স্বপ্ন দেখল, হঠাৎ মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা খুলে পড়ে গেল। স্বপ্ন দেখার দু দিন পর দেখা গেল। সত্যি-সত্যি সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে গেছে। এই ধরনের স্বপ্নকে বলে প্রিগগ্নিশন ড্রীম (Precognition dream)। এর একটিই ব্যাখ্যা—স্বপ্নে মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে—যা সম্ভব নয়। কাজেই এ-জাতীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যাতীত।

আমি বললাম, এমনো তো হতে পারে যে, কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে।

হতে পারে। প্রচুর কাকতালীয় ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটছে। তবে কাকতালীয় ব্যাপারগুলিকেও একটা স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর থাকতে হবে।। Precognition dream- এর ক্ষেত্রে তা থাকে না।

বুঝতে পারছি না।

বোঝানো একটু কঠিন। আমি বরং স্বপ্ন সম্পর্কে একটা গল্প বলি-শুনতে চান?

বলুন শুনি-ভৌতিক কিছু?

না–ভৌতিক না।–তবে রহস্যময় তো বটেই। আরেক দফা চা হয়ে যাক।

হোক।

কী ঠিক করলেন? থেকে যাবেন? বৃষ্টি বাড়ছে। আমি থেকে যাওয়াই ঠিক করলাম। মিসির আলি চা নিয়ে বিছানায় পা তুলে বসলেন। গল্প শুরু হল।

ছোটবেলায় আমাদের বাসায় খাবনামা নামে একটা স্বপ্নতত্ত্বের বই ছিল! কোন স্বপ্ন দেখলে কী হয় সব ঐ বইয়ে লেখা। আমার মা ছিলেন বইটার বিশেষ ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই বলতেন, ও মিসির, বইটা একটু দেখ তো। একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের মানে কি বল!

আমি বই নিয়ে বসতাম।

দেখ তো বাবা, গরু স্বপ্ন দেখলে কী হয়।

আমি বই উল্টে জিজ্ঞেস করলাম, কী রঙের গরু, মা? সাদা না কালো?

এই তো মুশকিলে ফেললি, সাদা না কালো খেয়াল নেই।

সাদা রঙের গরু হলে—ধনলাভ। কালো রঙের গরু হলো-বিবাদ!

কার সঙ্গে বিবাদ? তোর বাবার সাথে?

লেখা নেই তো মা!

মা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। স্বপ্ন নিয়ে চিন্তার তাঁর কোনো শেষ ছিল না। আর কত বিচিত্র স্বপ্ন যে দেখতেন—একবার দেখলেন দুটো অন্ধ চড়ুই পাখি। খাবনামায় অন্ধ চড়ুই পাখি দেখলে কী হয় লেখা নেই। কবুতর দেখলে কী হয় লেখা আছে। মার কারণেই খাবনামা

ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একসময় পুরো বইটা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। স্বপ্নবিশারদ হিসেবে আমার নাম রটে গেল! যে যা দেখে আমাকে এসে অর্থ জিজ্ঞেস করে। এই করতে গিয়ে জানলাম কত বিচিত্র স্বপ্নই না মানুষ দেখে। সেই সঙ্গে মজারমজার কিছু জিনিসও লক্ষ করলাম। যেমন-অসুস্থ মানুষরা সাধারণত বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। বোকা মানুষদের স্বীপুগুলি হয়। সরল ধরনের। বুদ্ধিমান মানুষরা খুব জটিল স্বপ্ন দেখে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখে, সেটা হচ্ছে কোনো একটি অনুষ্ঠানে সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবার গায়ে ভালো পোশাকআশাক, শুধু সে-ই পুরোপুরি নগ্ন কেউ তা লক্ষ করছে না!

মিসির আলি সাহেব কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই জাতীয় স্বপ্ন কি আপনি কখনো দেখেছেন?

আমি বললাম, না। একটা স্বপ্নই আমি বারবার দেখি-পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে বসেছি। খুব সহজ প্রশ্ন, সবগুলির উত্তর আমার জানা। লিখতে গিয়ে দেখি কলম দিয়ে কালি বেরুচ্ছে না। কলামটা বদলে অন্য কলম নিলাম।–সেটা দিয়েও কালি বেরুচ্ছে না। এদিকে ঘন্টা পড়ে গেছে।

এই স্বপ্নটাও খুব কমন। আমিও দেখি। একবার দেখলাম বাংলা পরীক্ষা- প্রশ্ন দিয়েছে অঙ্কের। কঠিন সব অঙ্ক। বান্দরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার অঙ্ক! একটা বঁদরের জায়গায় দুটো বাঁদর। একটা খানিকটা ওঠে, অন্যটা তার লেজ ধরে টেনে নিচে নামায়া-খুবই জটিল ব্যাপার। বাঁশের সবটা আকার তৈলাক্ত না, কিছুটা তেল ছাড়া.....

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সত্যিই কি এমন স্বপ্ন দেখেছেন?

জ্বি-না-ঠাট্টা করে বলছি।–জটিল সব অঙ্ক ছিল, এইটুকু মনে আছে। যাই হোক, ছোটবেলা থেকেই এইসব কারণে স্বপ্নের দিকে আমি ফুকলাম। দেশের বাইরে যখন প্যারাসাইকোলজি পড়তে গেলাম।–তখন স্পেশাল টপিক নিলাম ড্রিম। স্ট্রীম ল্যাবোরেটরিতে কাজও করলাম। আমার প্রফেসর ছিলেন ডঃ সুইন হার্ন, দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে যাকে পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। দুঃস্বপ্ন অ্যানালিসিসের তিনি একটা টেকনিক বের করেছেন, যার নাম সুইন হার্ন অ্যানালিসিস। সুইন হার্ন অ্যানালিসিসে ব্যাখ্যা করা যায় না। এমন সব দুঃস্বপ্নের একটা ফাইল তাঁর কাছে ছিল। সেই ফাইল তিনি তাঁর গ্রাজুয়েট ছাত্রদের দিতেন না। আমাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন, সম্ভবত সে-কারণেই সেই ফাইল ঘাঁটার সুযোগ হয়ে গেল। ফাইল পড়ে আমি হতভম্ব। ব্যাখ্যাতীত সব ব্যাপার। একটা উদাহরণ দিই-নিউ ইংল্যাণ্ডের একটি তেইশ বছর বয়েসী মেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করল। তার নাভিমূল থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে। স্বাভাবিক হাতের চেয়ে সরু-লম্বা-লম্বা আঙুল হাতটার রঙ নীলচে-খুব তুলতুলে। দুঃস্বপ্নটা সে প্রায়ই দেখতে লাগল! প্রতিবারই স্বপ্ন ভাঙত বিকট চিৎকারে। তাকে ড্রীম ল্যাবোরেটরিতে ভর্তি করা হল। প্রফেসর সুইন হার্ন রোগিণীর মনোবিশ্লেষণ করলেন। অস্বাভাবিক কিছুই পেলেন না। মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নিউ ইংল্যাণ্ডে। তার কিছুদিন পর মেয়েটি লক্ষ করল তার নাভিমূল ফুলে উঠেছে-একধরনের ননম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ হচ্ছে। একমাসের মধ্যে সেই টিউমার মানুষের হাতের আকৃতি ধারণ করল। টিউমারটির মাথায় মানুষের হাতের আঙুলের মতো পাঁচটি আঙুল...

আমি মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ভাই, এই গল্পটা থাক! শুনতে ভালো লাগছে না। ঘেন্না লাগছে!

ঘেন্না লাগার মতোই ব্যাপার। ছবি দেখলে আরো ঘেন্না লাগবে। মেয়েটির ছবি ছাপাযুছাি ট ইংল্যাও জার্নাল অব ডেসিনে। ছবি দেখতে চান?

জি-না।

পিএইচ. ডি. প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, পিএইচ. ডি. না-করেই ফিরতে হল! প্রফেসরের সঙ্গে ঝামেলা হল। যে-লোক আমাকে এত পছন্দ করত, সে-ই বিষনজরে দেখতে লাগল। এম. এস. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম টীচিং-এর একটা ব্যবস্থা হল। ছাত্রদের অ্যাবনরম্যাল বিহেভিয়ার পড়াই। স্বপ্ন সম্পর্কেও বলি। স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের অস্বাভাবিক আচরণের একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করি। ছাত্রদের বলি, তোমরা যদি কখনো কোনো ভয়ংকর স্বপ্ন দেখ, তাহলে আমাকে বলবে।

ছাত্ররা প্রায়ই এসে স্বপ্ন বলে যায়। ওদের কোনো স্বপ্নই তেমন ভয়ংকর না। সাপে তাড়া করছে, আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে-এই জাতীয় স্বপ্ন। আমার ইচ্ছা ছিল দুঃস্বপ্ন নিয়ে গবেষণার কিছু কাজ করব। সেই ইচ্ছা সফল হল না। দুঃস্বপ্ন দেখছে এমন লোকজনই পাওয়া গেল না। আমি গবেষণার কথা যখন ভুলে গেলাম, তখন এল লোকমান ফকির।

লোকমান ফকিরের বাড়ি কুমিল্লার নবীনগরে। বয়স ত্রিশ-পয়ত্রিশ। শিপিং করপোরেশনে মোটামুটি ধরনের চাকরি করে। দু-কামরার একটা বাড়ি ভাড়া করেছে। কাঁঠালবাগানে। বিয়ে করে নি। তবে বিয়ের চিন্তা-ভাবনা করছে। তার এক মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে মেয়েটিকে তার পছন্দ নয়। তবে অপছন্দের কথা সে সরাসরি বলতেও পারছে না। কারণ তার এই মামা তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন।

ছেলেটি এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি তাকে দেখে চমকে উঠলাম। মুখ পাণ্ডুর বর্ণ, মৃত মানুষের চোখের মতো ভাবলেশহীন চোখ। যৌবনের নিজস্ব যে-জ্যোতি যুবক-যুবতীর চোখে থাকে তার কিছুই নেই। ছেলেটি হাঁটছে খুঁড়িয়ে-খুড়য়ে, কিছুক্ষণ পরপরই চমকে উঠছে। সে ঘরে ঢুকেই বিনা ভূমিকায় বলল, স্যার, আপনি আমাকে বাঁচান।

আমি ছেলেটিকে বসালাম। পরিচয় নিলাম! হালকা কিছু কথাবার্তা বলে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। তাতে খুব লাভ হল বলে মনে হল না। তার অস্থিরতা কমল না। লক্ষ করলাম, সে স্থির হয়ে বসতেও পারছে না। খুব নড়াচড়া করছে। আমি বললাম, তোমার সমস্যাটা কী?

ছেলেটি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল, স্যার, আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।

আমি বললাম, দুঃস্বপ্ন দেখে না। এমন মানুষ তুমি খুঁজে পাবে না! সাপে তাড়া করছে, বাঘে তাড়া করছে, আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া—এগুলি খুবই কমন স্বপ্ন। সাধারণত হজমের অসুবিধা হলে লোকজন দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের অসুবিধা হলেও দেখে! তুমি শুয়ে আছ, মাথার নিচ থেকে বালিশ সরে গেল, তখনো এ-রকম স্বপ্ন তুমি দেখতে পার। শারীরিক অস্বস্তির একটা প্রকাশ ঘটে দুঃস্বপ্নে। আগুনে পোড়ার স্বপ্ন। মানুষ কখন দেখে জানা? যখন পেটে গ্যাস হয়, সেই গ্যাসে বুক জ্বালাপোড়া করে— তখন সে স্বপ্ন দেখে তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

স্যার, আমার স্বপ্ন এ-রকম না। অন্য রকম।

ঠিক আছে, গুছিয়ে বল। শুনে দেখি কী রকম।

ছেলেটি সঙ্গে-সঙ্গে কথা শুরু করল। মুখস্থ বলে যাবার মতো বলে যেতে লাগল! মনে হয় আগে থেকে ঠিকঠাক করে এসেছে এবং অনেক বার রিহার্সেল দিয়েছে।

কথা বলার সময় একবারও আমার চোখের দিকে তাকাল না। যখন প্রশ্ন করলাম তখনো না।

প্রথম স্বপ্নটা দেখি বুধবার রাতে। এগারটার দিকে ঘুমুতে গেছি! আমার ঘুমের কোনো সমস্যা নেই! শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারি। সে-রাতেও তাই হল! বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। সঙ্গে-সঙ্গেই স্বপ্নটা দেখেছি।

কী করে বুঝলে শোয়ামাত্র স্বপ্ন দেখেছ?

জেগে উঠে ঘড়ি দেখেছি, এগারটা দশ।

স্বপ্নটা বল।

আমি দেখলাম খোলামেলা একটা মাঠের মতো জায়গা। খুব বাতাস বইছে। শোশোঁ শব্দ হচ্ছে। রীতিমতো শীত লাগছে। আমার চারদিকে অনেক মানুষ, কিন্তু ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি। হাসির শব্দ শুনছি? একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে-তাও শুনছি। বুড়োমতো একটা লোকের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কাউকে

আবছাভাবেও দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হল আমি বোধহয় অন্ধ হয়ে গেছি। চারদিকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে তোকালাম–মাঠ দেখতে পাচ্ছি, কুয়াশা দেখতে পাচ্ছি-কিন্তু মানুষজন দেখছি না, অথচ তাদের কথা শুনছি। হঠাৎ ওদের কথাবার্তা সব থেমে গেল। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দও বন্ধ হয়ে গেল! মনে হল কেউ যেন এসেছে। তার ভয়ে সবাই চুপ করে গেছে। আমার নিজেরও প্রচণ্ড ভয় লাগল। একধরনের অন্ধ ভয়।

তখন শ্লেষ্মাজড়িত মোটা গলায় একজন বলল, ছেলেটি তো দেখি এসেছে। মেয়েটা কোথায়?

কেউ জবাব দিল না। খানিকক্ষণের জন্যে বাচ্চা ছেলেটির কান্না শোনা গেল, সঙ্গেসঙ্গে থেমেও গেল। মনে হল কেউ যেন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ভারি গলার লোকটা আবার কথা বলল, মেয়েটা দেরি করছে কেন? কেন এত দেরি? ছেলেটিকে তো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। এর ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। ও জেগে যাবে।

হঠাৎ চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। একসঙ্গে সবাই বলে উঠল, এসেছে, এসেছে, মেয়েটা এসেছে। আমি চমকে উঠে দেখলাম আমার পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব রোগা একটা মেয়ে। অসম্ভব ফরাসা, বয়স আঠার-উনিশ। এলোমেলোভাবে শাড়ি পরা। লম্বা চুল! চুলগুলি ছেড়ে দেওয়া, বাতাসে উড়ছে। মেয়েটা ভয়ে থারথার করে কাঁপছে। আমি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। সে অসংকোচে আমার হাত ধরে কাপা গলায় বলল, আমার ভয় করছে। আমার ভয় করছে!

আমি বললাম, আপনি কে?

সে বলল, আমার নাম নাগিন্স। আপনি যা দেখছেন তা স্বপ্ন। ভয়ংকর স্বপ্ন! একটু পরই বুঝবেন। আগে এই স্বপ্নটা শুধু আমি একা দেখতাম। এখন মনে হয় আপনিও দেখবেন।

মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কাঁদতেকাঁদতেই বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার ভয় লাগছে বলেই আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এরা প্রতি মাসে একবার করে আমাকে এই স্বপ্নটা দেখায়।

আমি বললাম, এরা কারা?

জানি না। কিছু জানি না। আপনি থাকায় কেন জানি একটু ভরসা পাচ্ছি। যদিও জানি আপনি কিছুই করতে পারবেন না। কিছুই না, কিছুই না, কিছুই না।

মেয়েটি হাঁপাতে শুরু করল আর তখন সেই ভারি এবং শ্লেষ্মাজড়ানো কণ্ঠ চিৎকার করে বলল, সময় শেষ। দৌড়াও, দৌড়াও, দৌড়াও!

সেই চিৎকারের মধ্যে ভয়ংকর পৈশাচিক কিছু ছিল। আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে কুয়াশা কেটে যেতে লাগল-চারদিকে তীব্র আলো! এত তীব্র যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যাদের কথা শুনছিলাম। অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না, এই আলোয় সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম-এ।রা এরা এরা...

এরা কী?

এরা মানুষ না, অন্য কিছু-লম্বাটে পশুর মতো মুখ, হাত-পা মানুষের মতো। সবাই নগ্ন। এরা অদ্ভুত একধরনের শব্দ করতে লাগল! আমার কানে বাজতে লাগল-দৌড়াও দৌড়াও ... আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম। আমাদের পিছনে সেই জন্তুর মতো মানুষগুলিও দৌড়াচ্ছে।

আমরা ছুটছি মাঠের ওপর দিয়ে। সেই মাঠে কোনো ঘাস নেই। সমস্ত মাঠময় অযুত নিযুত লক্ষ কোটি ধারাল ব্লেড সারি-সারি সাজান। সেই ব্লেডে আমার পা কেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে-তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। চিৎকার করে উঠলাম, আর তখনই ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ঘামে সমস্ত বিছানা ভিজে গেছে!

এই তোমার স্বপ্ন?

জ্বি।

দ্বিতীয় স্বপ্ন কখন দেখলে?

ঠিক একমাস পর।

সেই মেয়েটিও কি দ্বিতীয় স্বপ্নে তোমার সঙ্গে ছিল?

জ্বি।

একই স্বপ্ন, না একটু অন্য রকম?

একই স্বপ্ন।

মায় বারও কিছুই মেটের হাত ধরে দৌড়ালে।

জ্বি।

প্রথম বার যেমন তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল, দ্বিতীয় বারও হল?

জ্বি।

দ্বিতীয় বারও কি মেয়েটি পরে এসেছে? তুমি আগে এসে অপেক্ষা করছিলে?

জ্বি-না।–দ্বিতীয় বারে মেয়েটি আগে এসেছিল, আমি পরে এসেছি।

দ্বিতীয় বারের স্বপ্ন তুমি রাত কটায় দেখেছ?

ঠিক বলতে পারব না, তবে শেষরাতের দিকে। ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান হল।

দ্বিতীয় বারও স্বল্প মোটা গলার লোক কথা কাল।

জ্বি।

লোকমান ফকির রুমালে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। সে অসম্ভব ঘামছে। আমি বললাম, পানি খাবে? পানি এনে দেব?

জ্বি স্যার, দিন।

আমি পানি এনে দিলাম, সে এক নিঃশ্বাসে পানি শেষ করে ফেলল। আমি বললাম, স্বপ্ন ভাঙার পর তুমি দেখলে, তোমরা দুটি পা-ই ব্লেডে কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।–তাই না?

লোকমান হতভম্ব হয়ে বলল, ত্বি স্যার! আপনি কী করে বুঝলেন?

তুমি খুঁড়িয়ে-খুড়িয়ে ঘরে ঢুকলে, সেখান থেকে অনুমান করেছি। তা ছাড়া তোমার পা স্বপ্ন দেখার পর কেটে যাচ্ছে বলেই স্বপ্নটা ভয়ংকর। পা যদি না-কাটত তাহলে স্বপ্নটা ভয়ংকর হত না, বরং একটা মধুর স্বপ্ন হত। কারণ স্বপ্নে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হচ্ছে, যে তোমার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। আঠার-উনিশ বছরের রূপবতী একটি মেয়ে, হাত ধরে তোমার সঙ্গে দৌড়াচ্ছে।

আমার কথার মাঝখানেই লোকমান ফকির পায়ের জুতো খুলে ফেলল, মোজা খুলল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম, পায়ের তলা ফালা-ফালা করে কোটা! এমন কিছু সত্যি-সত্যি ঘটতে পারে। আমি ভাবি নি।

লোকমান ক্ষীণ গলায় বলল, এটা কী করে হয় স্যার?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে স্বপ্নের ব্যাপারে পড়াশোনা যা করেছি। তার থেকে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি—Iunvert reaction বলে একটা ব্যাপার আছে। ধরা, তোমার একটা আঙুল পুড়ে গেল-সেই খবর স্নায়ুর মাধ্যমে যখন তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছবে, তখন তুমি তীব্র ব্যথা পাবে। Invertreaction-এ কী হয় জান? আগে মস্তিষ্কে আঙুলটি

পোড়ার অনুভূতি পায়, তারপর সেই খবর আঙুলে পৌঁছে তখন আঙুলটি পোড়া-পোড়া হয়ে যেতে পারে। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটা হয় মস্তিকে। সেখানে থেকে Invert reaction-এ শরীরে তার প্রভাব পড়তে পারে।

এক লোক স্বপ্নে দেখত, তার হাতে কে যেন পিন ফোটাচ্ছে। ঘুম ভাঙার পর তার হাতে সত্যি-সত্যি পিন ফোটার দাগ দেখা যেত! তোমার ক্ষেত্রেও হয়তো তাই ঘটেছে। তবে এমন ভয়াবহভাবে পা কাটা অভিশণর ব্লণটার্ডধমভ- এ সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

তাহলে কী?

আমি বুঝতে পারছি না।

লোকমান ক্লান্ত স্বরে বলল, এক মাস পরপর আমি স্বপ্নটা দেখি। কারণ পায়ের ঘা শুকাতে এক মাস লাগে।

আমি লোকমান ফকিরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, তুমি এখন থেকে একটা কাজ করবে-ঘুমুতে যাবে জুতো পায়ে দিয়ে। স্বপ্নে যদি তোমাকে দৌড়াতেও হয়-তোমার পায়ে থাকবে জুতো! ব্লেড তোমাকে কিছু করতে পারবে না।

সত্যি বলছেন?

আমার তাই ধারণা। আমার মনে হচ্ছে জুতো পরে ঘুমুলে তুমি স্বপ্নটাই আর দেখবে না।

লোকমান ফকির চলে গেল। খুব ভরসা পেল বলে মনে হল না। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম এক মাস পর স্বপ্ন দেখা হয়ে গেলে সে যেন আসে। সে এল দেড় মাস পর।

তার মুখ আগের চেয়েও শুকনো, চোখ ভাবলেশহীন। অথর্ব মানুষের মতো হাঁটছে। আমি বললাম, স্বপ্ন দেখেছ?

জ্বি-না।

জুতো পায়ে ঘুমুচ্ছ?

জ্বি স্যার। জুতো পায়ে দেওয়ার জন্যেই স্বপ্ন দেখছি না।

আমি হাসিমুখে বললাম, তাহলে তো তোমার রোগ সেরে গেল। এত মন-খারাপ কেন? মনে হচ্ছে বিরাট সমস্যায় পড়েছি। সমস্যাটা কী?

লোকমান নিচু গলায় বলল, মেয়েটার জন্যে মন খারাপ স্যার। বেচারি একাএক স্বপ্ন দেখছে। এত ভালো একটা মেয়ে কষ্ট করছে। আমি সঙ্গে থাকলে সে একটু ভরসা পায়। নিজের জন্যে কিছু না। মেয়েটার জন্যে খুব কষ্ট হয়।

লোকমানের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম-সে বলে কী।

স্যার, আমি ঠিক করেছি। জুতো পরব না। যা হবার হবে। নার্গিসকে এক-একা যেতে দেব না। আমি থাকব সঙ্গে। মেয়েটার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় স্যার। এত চমৎকার একটা মেয়ে! আমি স্যার থাকব তার সঙ্গে।

সেটা কি ভালো হবে?

জ্বি স্যার হবে। আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না।

সে কিন্তু স্বপ্নের একটি মেয়ে।

সে স্বপ্নের মেয়ে নয়! আমি যেমন, সেও তেমন। আমরা দু জন এই পৃথিবীতেই বাস করি। সে হয়তো ঢাকাতেই কোনো এক বাসায় থাকে। তার পায়ে ব্লেডের কাটা। আমি যেমন সারাক্ষণ তার কথা ভাবি, সেও নিশ্চয়ই ভাবে। শুধু আমাদের দেখা হয় স্বপ্নে।

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, গল্পটি এই পর্যন্তই।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, এই পর্যন্ত মানে? শেষটা কী?

শেষটা আমি জানি না। ছেলেটি ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে একবার এসেছিল। সে বলল, জুতো খুলে ঘুমানোমাত্রই সে আবার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে মেয়েটির দেখা পায়। তারা দু জন খানিকক্ষণ গল্প করে। দু জনকে জড়িয়ে ধরে কান্দে। এক সময় মানুষের মতো জন্তুগুলো চেঁচিয়ে বলে–দৌড়াও, দৌড়াও! তারা দৌড়াতে শুরু করে।

ছেলেটি আপনার কাছে আর আসে নি?

জ্বি-না।

ছেলেটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?

না, জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। ছেলেটি জানে জুতো পায়ে ঘুমুলে এই দুঃস্বপ্ন সে দেখবে না, তার পরেও জুতো পায়ে দেয় না। কারণ মেয়েটিকে একা ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেমের ক্ষমতা যে কী প্রচণ্ড হতে পারে, প্রেমে নাপড়লে তা বোঝা যায না। ছেলেটির পক্ষে এই জীবনে তার স্বপ্নসঙ্গিনীর মায়া কাটানো সম্ভব না। সে বাকি জীবনে কখনো জুতো পায়ে ঘুমুবে না। সে আসলে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি চায় না। দুঃস্বপ্ন হলেও এটি সেইসঙ্গে তাঁর জীবনের মধুরতম স্বপ্ন।

আপনার কি ধারণা, নার্গিস নামের কোনো মেয়ে এই পৃথিবীতে সত্যি-সত্যি আছে?

মিসির আলি নিছু গলায় বললেন, আমি জানি না। রহস্যময় এই পৃথিবীর খুব কম রহস্যের সন্ধানই আমি জানি। তবে মাঝে-মাঝে আমার কেন জানি এই মেয়েটির হাত ধরে একবার দৌড়াতে ইচ্ছা করে- আরেক দফা চা হবে? পানি কি গরম করব?

সঙ্গিনী (গল্প)

মিসির আলি বললেন, গল্প শুনবেন নাকি?

আমি ঘড়ির দিকে তাকলাম। রাত মন্দ হয় নি। দশটার মতো বাজে। বাসায়

ফেরা দরকার। আকাশের অবস্থাও ভালো না। গুড়গুড করে মেঘ ডাকছে। আষাঢ় মাস।

যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

আমি বললাম, আজ থাক, আরেক দিন শুনব। রাত অনেক হয়েছে। বাসায় চিন্তা করবে।

মিসির আলি হেসে ফেললেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, হাসছেন কেন?

মিসির আলি হাসাতে-হাসতেই বললেন, বাসায় কে চিন্তা করবে? আপনার স্ত্রী কি বাসায় আছেন? আমার তো ধারণা তিনি রাগ করে বাচ্চাদের নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন।

মিসির আলির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সামান্য সূত্র ধরে সিদ্ধান্তে চলে যাবার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে আমি পরিচিত। তবুও বিস্মিত হলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ দুপুরেই বড় ধরনের ঝগড়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় সে সুটকেস গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেছে। এক-একা খালি বাড়িতে থাকতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল বলে মিসির আলির কাছে এসেছি, তবে এই ঘটনার কিছুই বলি নি। আগ বাড়িয়ে পারিবারিক ঝগড়ার কথা বলে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।

আমি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললাম, ঝগড়া হয়েছে বুঝলেন কী করে?

অনুমানে বলছি।

অনুমানটাই-বা কী করে করলেন?

আমি লক্ষ করলাম, আপনি আমার কাছে কোনো কাজে আসেন নি। সময় কাটাতে এসেছেন। গল্প করছেন এবং আমার গল্প শুনছেন। কোনো কিছুতেই তেমন আনন্দ পাচ্ছেন না। অর্থাৎ কোনো কারণে মন বিক্ষিপ্ত। আমি বললাম, ভাবি কেমন আছেন? আপনি বললেন, ভালো! কিন্তু বলার সময় আপনার মুখ কঠিন হয়ে গেল। অর্থাৎ ভাবির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি তখন নিশ্চিত হবার জন্যে বললাম, আমার সঙ্গে চারটা ভাত খান। আপনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি ধরে নিলাম।–রাগারগি হয়েছে এবং আপনার স্ত্রী বাসায় নেই। আপনার এক-এক লাগছে বলেই আপনি এসেছেন আমার কাছে। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্যে শার্লক হোমস হতে হয় না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

আমি কিছু বললাম না। মিসির আলি বললেন, চা চড়াচ্ছি। চা খেয়ে গল্প শুনুন, তারপর এইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। খালি বাসায় এক-একা রাত কাটাতে ভালো লাগবে না। তা ছাড়া বৃষ্টি নামল বলে।

এটাও কি আপনার লজিক্যাল ডিডাকশান?

না—এটা হচ্ছে উইশফুল থিংকিং। গরমে কষ্ট পাচ্ছি–বৃষ্টি হলে জীবন বাঁচে। তবে বাতাস ভারি, বৃষ্টির দেরি নেই বলে আমার ধারণা।

বাতাসের আবার হালকা-ভারি কী?

আছে। হালকা-ভারির ব্যাপার আছে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় বাতাস হয় ভারি। সেটা আমি বুঝতে পারি মাথায় চুলে হাত দিয়ে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাথার চুল নরম বা শক্ত হয়। শীতকালে মাথার চুলে হাত দিয়ে দেখবেন একরকম, আবার গরমকালে যখন বাতাসে হিউমিডিটি অনেক বেশি, তখন অন্যরকম।

আমার কাছে তো সবসময় একরকম লাগে।

মিসির আলি ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। ভাবটা এ-রকম, যেন এর চেয়ে মজার কথা আগে শোনেন নি। আমি বোকার মতো বসে রইলাম। অস্বস্তিও লাগতে লাগল। খুব বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে গল্প করার মধ্যেও একধরনের অস্বস্তি থাকে। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

মিসির আলি স্টোভে চায়ের পানি বসিয়ে দিলেন। শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। এই যুগে স্টোভ প্রায় চোখেই পড়ে না। মিসির আলি এই বস্তু কোথেকে জোগাড় করেছেন। কে জানে! কিছুক্ষণ পরপর পাম্প করতে হয়। অনেক যন্ত্রণা।

চায়ের কাপ হাতে বিছানায় এসে বসামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। তুমুল বর্ষণ। মিসির আলি বললেন, আমার বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কেন জানেন?

জানি না।

বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না-করণ সেখানে ঝড়-বৃষ্টি নেই। এয়ারকুলার বসানো একটা ঘরের মতো সেখানকার আবহাওয়া। তাপ বাড়বেও না, কমবেও না! অনন্ত কাল একই থাকবে। কোনো মানে হয়?

আপনি কি বেহেশত-দোজখ এইসব নিয়ে মাথা ঘামান?

না, ঘামাই না।

সৃস্টিকর্তা নিয়ে মাথা ঘামান? হ্যাঁ, ঘামাই। খুব চিন্তা করি, কোনো কুল-কিনারা পাই না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থ কী বলে, জানেন? বলে—সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর পারেন না এমন কিছুই নেই। তিনি সব পারেন। অথচ আমার ধারণা তিনি দুটো জিনিস পারেন না, যা মানুষ পারে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, উদাহরণ দিন।

সৃস্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না-মানুষ পারে। আবার সৃস্টিকর্তা দ্বিতীয় একজন সৃষ্টিকর্তা তৈরি করতে পারেন না। মানুষ কিন্তু পারে, সে সন্তানের জন্ম দেয়।

আপনি তাহলে একজন নাস্তিক?

না, আমি নাস্তিক না। আমি খুবই আস্তিক। আমি এমন সব রহস্যময় ঘটনা আমার চারপাশে ঘটতে দেখেছি যে বাধ্য হয়ে আমাকে অস্তিক হতে হয়েছে। ব্যাখ্যাতীত সব ঘটনা। যেমন স্বপ্নের কথাটাই ধরুন। সামান্য স্বপ্ন, অথচ ব্যাখ্যাতীত একটা ঘটনা।

ব্যাখ্যাতীত হবে কেন? ফ্রয়েড তো চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন বলে শুনেছি।

মোটেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেন নি। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটাই তিনি অবদমিত কামনার ওপর চাপিয়ে দিয়ে লিখলেন—Interpretations ofdream। তিনি শুধু বিশেষ একধরনের স্বপ্নই ব্যাখ্যা করলেন। অন্য দিক সম্পর্কে চুপ করে রইলেন। যদিও তিনি খুব ভালো করে জানতেন মানুষের বেশ কিছু স্বপ্ন আছে, যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি এই নিয়ে প্রচুর কাজও করেছেন, কিন্তু প্রকাশ করেন নি। নষ্ট করে ফেলেছেন! তাঁর ছাত্র প্রফেসর ইয়ুং কিছু কাজ করেছেন—মূল সমস্যায় পৌঁছতে পারেননি,বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কিছু-কিছু স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে তা বলা যাচ্ছে না। যেমন-একটা লোক স্বপ্ন দেখল, হঠাৎ মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা খুলে পড়ে গেল। স্বপ্ন দেখার দু দিন পর দেখা গেল। সত্যি-সত্যি সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে গেছে। এই ধরনের স্বপ্নকে বলে প্রিগগ্‌নিশন ড্রীম (Precognition dream)। এর একটিই ব্যাখ্যা—স্বপ্নে মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে—যা সম্ভব নয়। কাজেই এ-জাতীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যাতীত।

আমি বললাম, এমনো তো হতে পারে যে, কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে।

হতে পারে। প্রচুর কাকতালীয় ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটছে। তবে কাকতালীয় ব্যাপারগুলিকেও একটা স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর থাকতে হবে।। Precognition dream- এর ক্ষেত্রে তা থাকে না।

বুঝতে পারছি না।

বোঝানো একটু কঠিন। আমি বরং স্বপ্ন সম্পর্কে একটা গল্প বলি-শুনতে চান?

বলুন শুনি-ভৌতিক কিছু?

না–ভৌতিক না।–তবে রহস্যময় তো বটেই। আরেক দফা চা হয়ে যাক।

হোক।

কী ঠিক করলেন? থেকে যাবেন? বৃষ্টি বাড়ছে। আমি থেকে যাওয়াই ঠিক করলাম। মিসির আলি চা নিয়ে বিছানায় পা তুলে বসলেন। গল্প শুরু হল।

ছোটবেলায় আমাদের বাসায় খাবনামা নামে একটা স্বপ্নতত্ত্বের বই ছিল! কোন স্বপ্ন দেখলে কী হয় সব ঐ বইয়ে লেখা। আমার মা ছিলেন বইটার বিশেষ ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই বলতেন, ও মিসির, বইটা একটু দেখ তো। একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের মানে কি বল!

আমি বই নিয়ে বসতাম।

দেখ তো বাবা, গরু স্বপ্ন দেখলে কী হয়।

আমি বই উল্টে জিজ্ঞেস করলাম, কী রঙের গরু, মা? সাদা না কালো?

এই তো মুশকিলে ফেললি, সাদা না কালো খেয়াল নেই।

সাদা রঙের গরু হলে—ধনলাভ। কালো রঙের গরু হলো-বিবাদ!

কার সঙ্গে বিবাদ? তোর বাবার সাথে?

লেখা নেই তো মা!

মা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। স্বপ্ন নিয়ে চিন্তার তাঁর কোনো শেষ ছিল না। আর কত বিচিত্র স্বপ্ন যে দেখতেন—একবার দেখলেন দুটো অন্ধ চড়ুই পাখি। খাবনামায় অন্ধ চড়ুই পাখি দেখলে কী হয় লেখা নেই। কবুতর দেখলে কী হয় লেখা আছে। মার কারণেই খাবনামা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একসময় পুরো বইটা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। স্বপ্নবিশারদ হিসেবে আমার নাম রটে গেল! যে যা দেখে আমাকে এসে অর্থ জিজ্ঞেস করে। এই করতে গিয়ে জানলাম কত বিচিত্র স্বপ্নই না মানুষ দেখে। সেই সঙ্গে মজারমজার কিছু জিনিসও লক্ষ করলাম। যেমন-অসুস্থ মানুষরা সাধারণত বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। বোকা মানুষদের স্বীপুগুলি হয়। সরল ধরনের। বুদ্ধিমান মানুষরা খুব জটিল স্বপ্ন দেখে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখে, সেটা হচ্ছে কোনো একটি অনুষ্ঠানে সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবার গায়ে ভালো পোশাকআশাক, শুধু সে-ই পুরোপুরি নগ্ন কেউ তা লক্ষ করছে না!

মিসির আলি সাহেব কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই জাতীয় স্বপ্ন কি আপনি কখনো দেখেছেন?

আমি বললাম, না। একটা স্বপ্নই আমি বারবার দেখি-পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে বসেছি। খুব সহজ প্রশ্ন, সবগুলির উত্তর আমার জানা। লিখতে গিয়ে দেখি কলম দিয়ে কালি বেরুচ্ছে না। কলামটা বদলে অন্য কলম নিলাম।–সেটা দিয়েও কালি বেরুচ্ছে না। এদিকে ঘন্টা পড়ে গেছে।

এই স্বপ্নটাও খুব কমন। আমিও দেখি। একবার দেখলাম বাংলা পরীক্ষা- প্রশ্ন দিয়েছে অঙ্কের। কঠিন সব অঙ্ক। বান্দরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার অঙ্ক! একটা বঁদরের জায়গায় দুটো বাঁদর। একটা খানিকটা ওঠে, অন্যটা তার লেজ ধরে টেনে নিচে নামায়া-খুবই জটিল ব্যাপার। বাঁশের সবটা আকার তৈলাক্ত না, কিছুটা তেল ছাড়া.....

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সত্যিই কি এমন স্বপ্ন দেখেছেন?

জ্বি-না-ঠাট্টা করে বলছি।–জটিল সব অঙ্ক ছিল, এইটুকু মনে আছে। যাই হোক, ছোটবেলা থেকেই এইসব কারণে স্বপ্নের দিকে আমি ফুকলাম। দেশের বাইরে যখন প্যারাসাইকোলজি পড়তে গেলাম।–তখন স্পেশাল টপিক নিলাম ট্রেম। স্ট্রীম ল্যাবোরেটরিতে কাজও করলাম। আমার প্রফেসর ছিলেন ডঃ সুইন হার্ন, দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে যাকে পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। দুঃস্বপ্ন অ্যানালিসিসের তিনি একটা টেকনিক বের করেছেন, যার নাম সুইন হার্ন অ্যানালিসিস। সুইন হার্ন অ্যানালিসিসে ব্যাখ্যা করা যায় না। এমন সব দুঃস্বপ্নের একটা ফাইল তাঁর কাছে ছিল। সেই ফাইল তিনি তাঁর গ্রাজুয়েট ছাত্রদের দিতেন না। আমাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন, সম্ভবত সে-কারণেই সেই ফাইল ঘাঁটার সুযোগ হয়ে গেল। ফাইল পড়ে আমি হতভম্ব। ব্যাখ্যাতীত সব ব্যাপার। একটা উদাহরণ দিই-নিউ ইংল্যাণ্ডের একটি তেইশ বছর বয়েসী মেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করল। তার নাভিমূল থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে। স্বাভাবিক হাতের চেয়ে সরু-লম্বা-লম্বা আঙুল হাতটার রঙ নীলচে-খুব তুলতুলে। দুঃস্বপ্নটা সে প্রায়ই দেখতে লাগল! প্রতিবারই স্বপ্ন ভাঙত বিকট চিৎকারে। তাকে ড্রীম ল্যাবোরেটরিতে ভর্তি করা হল। প্রফেসর সুইন হার্ন রোগিণীর মনোবিশ্লেষণ করলেন। অস্বাভাবিক কিছুই পেলেন না। মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নিউ ইংল্যাণ্ডে। তার কিছুদিন পর মেয়েটি লক্ষ করল তার নাভিমূল ফুলে উঠেছে-একধরনের

ননম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ হচ্ছে। একমাসের মধ্যে সেই টিউমার মানুষের হাতের আকৃতি ধারণ করল। টিউমারটির মাথায় মানুষের হাতের আঙুলের মতো পাঁচটি আঙুল...

আমি মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ভাই, এই গল্পটা থাক! শুনতে ভালো লাগছে না। ঘেন্না লাগছে!

ঘেন্না লাগার মতোই ব্যাপার। ছবি দেখলে আরো ঘেন্না লাগবে। মেয়েটির ছবি ছাপায়ুছাি‌ট ইংল্যাও জার্নাল অব ডেসিনে। ছবি দেখতে চান?

জি-না।

পিএইচ. ডি. প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, পিএইচ. ডি. না-করেই ফিরতে হল! প্রফেসরের সঙ্গে ঝামেলা হল। যে-লোক আমাকে এত পছন্দ করত, সে-ই বিষনজরে দেখতে লাগল। এম. এস. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম টীচিং-এর একটা ব্যবস্থা হল। ছাত্রদের অ্যাবনরম্যাল বিহেভিয়ার পড়াই। স্বপ্ন সম্পর্কেও বলি। স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের অস্বাভাবিক আচরণের একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করি। ছাত্রদের বলি, তোমরা যদি কখনো কোনো ভয়ংকর স্বপ্ন দেখ, তাহলে আমাকে বলবে।

ছাত্ররা প্রায়ই এসে স্বপ্ন বলে যায়। ওদের কোনো স্বপ্নই তেমন ভয়ংকর না। সাপে তাড়া করছে, আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে-এই জাতীয় স্বপ্ন। আমার ইচ্ছা ছিল দুঃস্বপ্ন নিয়ে গবেষণার কিছু কাজ করব। সেই ইচ্ছা সফল হল না। দুঃস্বপ্ন দেখছে এমন লোকজনই পাওয়া গেল না। আমি গবেষণার কথা যখন ভুলে গেলাম, তখন এল লোকমান ফকির।

লোকমান ফকিরের বাড়ি কুমিল্লার নবীনগরে। বয়স ত্রিশ-পয়ত্রিশ। শিপিং করপোরেশনে মোটামুটি ধরনের চাকরি করে। দু-কামরার একটা বাড়ি ভাড়া করেছে। কাঁঠালবাগানে। বিয়ে করে নি। তবে বিয়ের চিন্তা-ভাবনা করছে। তার এক মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে মেয়েটিকে তার পছন্দ নয়। তবে অপছন্দের কথা সে সরাসরি বলতেও পারছে না। কারণ তার এই মামা তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন।

ছেলেটি এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি তাকে দেখে চমকে উঠলাম। মুখ পাণ্ডুর বর্ণ, মৃত মানুষের চোখের মতো ভাবলেশহীন চোখ। যৌবনের নিজস্ব যে-জ্যোতি যুবক-যুবতীর চোখে থাকে তার কিছুই নেই। ছেলেটি হাঁটছে খুঁড়িয়ে-খুড়য়ে, কিছুক্ষণ পরপরই চমকে উঠছে। সে ঘরে ঢুকেই বিনা ভূমিকায় বলল, স্যার, আপনি আমাকে বাঁচান।

আমি ছেলেটিকে বসালাম। পরিচয় নিলাম! হালকা কিছু কথাবার্তা বলে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। তাতে খুব লাভ হল বলে মনে হল না। তার অস্থিরতা কমল না। লক্ষ করলাম, সে স্থির হয়ে বসতেও পারছে না। খুব নড়াচড়া করছে। আমি বললাম, তোমার সমস্যাটা কী?

ছেলেটি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল, স্যার, আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।

আমি বললাম, দুঃস্বপ্ন দেখে না। এমন মানুষ তুমি খুঁজে পাবে না! সাপে তাড়া করছে, বাঘে তাড়া করছে, আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া—এগুলি খুবই কমন স্বপ্ন। সাধারণত

হজমের অসুবিধা হলে লোকজন দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের অসুবিধা হলেও দেখে! তুমি শুয়ে আছ, মাথার নিচ থেকে বালিশ সরে গেল, তখনো এ-রকম স্বপ্ন তুমি দেখতে পার। শারীরিক অস্বস্তির একটা প্রকাশ ঘটে দুঃস্বপ্নে। আগুনে পোড়ার স্বপ্ন। মানুষ কখন দেখে জানা? যখন পেটে গ্যাস হয়, সেই গ্যাসে বুক জ্বালাপোড়া করে— তখন সে স্বপ্ন দেখে তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

স্যার, আমার স্বপ্ন এ-রকম না। অন্য রকম।

ঠিক আছে, গুছিয়ে বল। শুনে দেখি কী রকম।

ছেলেটি সঙ্গে-সঙ্গে কথা শুরু করল। মুখস্থ বলে যাবার মতো বলে যেতে লাগল! মনে হয় আগে থেকে ঠিকঠাক করে এসেছে এবং অনেক বার রিহার্সেল দিয়েছে।

কথা বলার সময় একবারও আমার চোখের দিকে তাকাল না। যখন প্রশ্ন করলাম তখনো না।

প্রথম স্বপ্নটা দেখি বুধবার রাতে। এগারটার দিকে ঘুমুতে গেছি! আমার ঘুমের কোনো সমস্যা নেই! শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারি। সে-রাতেও তাই হল! বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। সঙ্গে-সঙ্গেই স্বপ্নটা দেখেছি।

কী করে বুঝলে শোয়ামাত্র স্বপ্ন দেখেছ?

জেগে উঠে ঘড়ি দেখেছি, এগারটা দশ।

স্বপ্নটা বল।

আমি দেখলাম খোলামেলা একটা মাঠের মতো জায়গা। খুব বাতাস বইছে। শোশোঁ শব্দ হচ্ছে। রীতিমতো শীত লাগছে। আমার চারদিকে অনেক মানুষ, কিন্তু ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি। হাসির শব্দ শুনছি? একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে-তাও শুনছি। বুড়োমতো একটা লোকের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কাউকে আবছাভাবেও দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হল আমি বোধহয় অন্ধ হয়ে গেছি। চারদিকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে তোকালাম–মাঠ দেখতে পাচ্ছি, কুয়াশা দেখতে পাচ্ছি-কিন্তু মানুষজন দেখছি না, অথচ তাদের কথা শুনছি। হঠাৎ ওদের কথাবার্তা সব থেমে গেল। বাতাসের শো-শোঁ শব্দও বন্ধ হয়ে গেল! মনে হল কেউ যেন এসেছে। তার ভয়ে সবাই চুপ করে গেছে। আমার নিজেরও প্রচণ্ড ভয় লাগল। একধরনের অন্ধ ভয়।

তখন শ্লেষ্মাজড়িত মোটা গলায় একজন বলল, ছেলেটি তো দেখি এসেছে। মেয়েটা কোথায়?

কেউ জবাব দিল না। খানিকক্ষণের জন্যে বাচ্চা ছেলেটির কান্না শোনা গেল, সঙ্গেসঙ্গে থেমেও গেল। মনে হল কেউ যেন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ভারি গলার লোকটা আবার কথা বলল, মেয়েটা দেরি করছে কেন? কেন এত দেরি? ছেলেটিকে তো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। এর ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। ও জেগে যাবে।

হঠাৎ চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। একসঙ্গে সবাই বলে উঠল, এসেছে, এসেছে, মেয়েটা এসেছে। আমি চমকে উঠে দেখলাম আমার পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব রোগা

একটা মেয়ে। অসম্ভব ফরাসা, বয়স আঠার-উনিশ। এলোমেলোভাবে শাড়ি পরা। লম্বা চুল! চুলগুলি ছেড়ে দেওয়া, বাতাসে উড়ছে। মেয়েটা ভয়ে থারথার করে কাঁপছে। আমি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। সে অসংকোচে আমার হাত ধরে কাপা গলায় বলল, আমার ভয় করছে। আমার ভয় করছে!

আমি বললাম, আপনি কে?

সে বলল, আমার নাম নাগিন্স। আপনি যা দেখছেন তা স্বপ্ন। ভয়ংকর স্বপ্ন! একটু পরই বুঝবেন। আগে এই স্বপ্নটা শুধু আমি একা দেখতাম। এখন মনে হয় আপনিও দেখবেন।

মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে আমার গা ঘেষে দাঁড়াল। কাঁদতেকাঁদতেই বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার ভয় লাগছে বলেই আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এরা প্রতি মাসে একবার করে আমাকে এই স্বপ্নটা দেখায়।

আমি বললাম, এরা কারা?

জানি না। কিছু জানি না। আপনি থাকায় কেন জানি একটু ভরসা পাচ্ছি। যদিও জানি আপনি কিছুই করতে পারবেন না। কিছুই না, কিছুই না, কিছুই না।

মেয়েটি হাঁপাতে শুরু করল আর তখন সেই ভারি এবং শ্লেষ্মাজড়ানো কণ্ঠ চিৎকার করে বলল, সময় শেষ। দৌড়াও, দৌড়াও, দৌড়াও!

সেই চিৎকারের মধ্যে ভয়ংকর পৈশাচিক কিছু ছিল। আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে কুয়াশা কেটে যেতে লাগল-চারদিকে তীব্র আলো!

এত তীব্র যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যাদের কথা শুনছিলাম। অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না, এই আলোয় সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম-এ।রা এরা এরা...

এরা কী?

এরা মানুষ না, অন্য কিছু-লম্বাটে পশুর মতো মুখ, হাত-পা মানুষের মতো। সবাই নগ্ন। এরা অদ্ভুত একধরনের শব্দ করতে লাগল! আমার কানে বাজতে লাগল-দৌড়াও দৌড়াও ... আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম। আমাদের পিছনে সেই জন্তুর মতো মানুষগুলিও দৌড়াচ্ছে।

আমরা ছুটছি মাঠের ওপর দিয়ে। সেই মাঠে কোনো ঘাস নেই। সমস্ত মাঠময় অযুত নিযুত লক্ষ কোটি ধারাল ব্লেড সারি-সারি সাজান। সেই ব্লেডে আমার পা কেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে-তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। চিৎকার করে উঠলাম, আর তখনই ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ঘামে সমস্ত বিছানা ভিজে গেছে!

এই তোমার স্বপ্ন?

জ্বি।

দ্বিতীয় স্বপ্ন কখন দেখলে?

ঠিক একমাস পর।

সেই মেয়েটিও কি দ্বিতীয় স্বপ্নে তোমার সঙ্গে ছিল?

জ্বি।

একই স্বপ্ন, না একটু অন্য রকম?

একই স্বপ্ন।

মায় বারও কিছুই মেটের হাত ধরে দৌড়ালে।

জ্বি।

প্রথম বার যেমন তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল, দ্বিতীয় বারও হল?

জ্বি।

দ্বিতীয় বারও কি মেয়েটি পরে এসেছে? তুমি আগে এসে অপেক্ষা করছিলে?

জ্বি-না।–দ্বিতীয় বারে মেয়েটি আগে এসেছিল, আমি পরে এসেছি।

দ্বিতীয় বারের স্বপ্ন তুমি রাত কটায় দেখেছ?

ঠিক বলতে পারব না, তবে শেষরাতের দিকে। ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান হল।

দ্বিতীয় বারও স্বল্প মোটা গলার লোক কথা কাল।

জ্বি।

লোকমান ফকির রুমালে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। সে অসম্ভব ঘামছে। আমি বললাম, পানি খাবে? পানি এনে দেব?

জ্বি স্যার, দিন।

আমি পানি এনে দিলাম, সে এক নিঃশ্বাসে পানি শেষ করে ফেলল। আমি বললাম, স্বপ্ন ভাঙার পর তুমি দেখলে, তোমরা দুটি পা-ই ব্লেডে কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।–তাই না?

লোকমান হতভম্ব হয়ে বলল, ত্বি স্যার! আপনি কী করে বুঝলেন?

তুমি খুঁড়িয়ে-খুড়িয়ে ঘরে ঢুকলে, সেখান থেকে অনুমান করেছি। তা ছাড়া তোমার পা স্বপ্ন দেখার পর কেটে যাচ্ছে বলেই স্বপ্নটা ভয়ংকর। পা যদি না-কাটত তাহলে স্বপ্নটা ভয়ংকর হত না, বরং একটা মধুর স্বপ্ন হত। কারণ স্বপ্নে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হচ্ছে, যে তোমার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। আঠার-উনিশ বছরের রূপবতী একটি মেয়ে, হাত ধরে তোমার সঙ্গে দৌড়াচ্ছে।

আমার কথার মাঝখানেই লোকমান ফকির পায়ের জুতো খুলে ফেলল, মোজা খুলল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম, পায়ের তলা ফালা-ফালা করে কোটা! এমন কিছু সত্যি-সত্যি ঘটতে পারে। আমি ভাবি নি।

লোকমান ক্ষীণ গলায় বলল, এটা কী করে হয় স্যার?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে স্বপ্নের ব্যাপারে পড়াশোনা যা করেছি। তার থেকে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি—Iunvert reaction বলে একটা ব্যাপার আছে। ধরা, তোমার একটা আঙুল পুড়ে গেল-সেই খবর স্নায়ুর মাধ্যমে যখন তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছবে, তখন তুমি তীব্র ব্যথা পাবে। Invertreaction-এ কী হয় জান? আগে মস্তিষ্কে আঙুলটি পোড়ার অনুভূতি পায়, তারপর সেই খবর আঙুলে পৌঁছে তখন আঙুলটি পোড়া-পোড়া হয়ে যেতে পারে। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটা হয় মস্তিকে। সেখানে থেকে Invert reaction-এ শরীরে তার প্রভাব পড়তে পারে।

এক লোক স্বপ্নে দেখত, তার হাতে কে যেন পিন ফোটাচ্ছে। ঘুম ভাঙার পর তার হাতে সত্যি-সত্যি পিন ফোটার দাগ দেখা যেত! তোমার ক্ষেত্রেও হয়তো তাই ঘটেছে। তবে এমন ভয়াবহভাবে পা কাটা অভিশণর ব্লণটার্ডধমভ- এ সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

তাহলে কী?

আমি বুঝতে পারছি না।

লোকমান ক্লান্ত স্বরে বলল, এক মাস পরপর আমি স্বপ্নটা দেখি। কারণ পায়ের ঘা শুকাতে এক মাস লাগে।

আমি লোকমান ফকিরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, তুমি এখন থেকে একটা কাজ করবে-ঘুমুতে যাবে জুতো পায়ে দিয়ে। স্বপ্নে যদি তোমাকে দৌড়াতেও হয়-তোমার পায়ে থাকবে জুতো! ব্লেড তোমাকে কিছু করতে পারবে না।

সত্যি বলছেন?

আমার তাই ধারণা। আমার মনে হচ্ছে জুতো পরে ঘুমুলে তুমি স্বপ্নটাই আর দেখবে না।

লোকমান ফকির চলে গেল। খুব ভরসা পেল বলে মনে হল না। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম এক মাস পর স্বপ্ন দেখা হয়ে গেলে সে যেন আসে। সে এল দেড় মাস পর।

তার মুখ আগের চেয়েও শুকনো, চোখ ভাবলেশহীন। অথর্ব মানুষের মতো হাঁটছে। আমি বললাম, স্বপ্ন দেখেছ?

জ্বি-না।

জুতো পায়ে ঘুমুচ্ছ?

জ্বি স্যার। জুতো পায়ে দেওয়ার জন্যেই স্বপ্ন দেখছি না।

আমি হাসিমুখে বললাম, তাহলে তো তোমার রোগ সেরে গেল। এত মন-খারাপ কেন? মনে হচ্ছে বিরাট সমস্যায় পড়েছি। সমস্যাটা কী?

লোকমান নিচু গলায় বলল, মেয়েটার জন্যে মন খারাপ স্যার। বেচারি একাএক স্বপ্ন দেখছে। এত ভালো একটা মেয়ে কষ্ট করছে। আমি সঙ্গে থাকলে সে একটু ভরসা পায়। নিজের জন্যে কিছু না। মেয়েটার জন্যে খুব কষ্ট হয়।

লোকমানের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম-সে বলে কী।

স্যার, আমি ঠিক করেছি। জুতো পরব না। যা হবার হবে। নার্গিসকে এক-একা যেতে দেব না। আমি থাকব সঙ্গে। মেয়েটার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় স্যার। এত চমৎকার একটা মেয়ে! আমি স্যার থাকব তার সঙ্গে।

সেটা কি ভালো হবে?

জ্বি স্যার হবে। আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না।

সে কিন্তু স্বপ্নের একটি মেয়ে।

সে স্বপ্নের মেয়ে নয়! আমি যেমন, সেও তেমন। আমরা দু জন এই পৃথিবীতেই বাস করি। সে হয়তো ঢাকাতেই কোনো এক বাসায় থাকে। তার পায়ে ব্লেডের কাটা। আমি যেমন সারাক্ষণ তার কথা ভাবি, সেও নিশ্চয়ই ভাবে। শুধু আমাদের দেখা হয় স্বপ্নে।

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, গল্পটি এই পর্যন্তই।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, এই পর্যন্ত মানে? শেষটা কী?

শেষটা আমি জানি না। ছেলেটি ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে একবার এসেছিল। সে বলল, জুতো খুলে ঘুমানোমাত্রই সে আবার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে মেয়েটির দেখা পায়। তারা দু জন

খানিকক্ষণ গল্প করে। দু জনকে জড়িয়ে ধরে কান্দে। এক সময় মানুষের মতো জন্তুগুলো চেঁচিয়ে বলে–দৌড়াও, দৌড়াও! তারা দৌড়াতে শুরু করে।

ছেলেটি আপনার কাছে আর আসে নি?

জ্বি-না।

ছেলেটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?

না, জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। ছেলেটি জানে জুতো পায়ে ঘুমুলে এই দুঃস্বপ্ন সে দেখবে না, তার পরেও জুতো পায়ে দেয় না। কারণ মেয়েটিকে একা ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেমের ক্ষমতা যে কী প্রচণ্ড হতে পারে, প্রেমে নাপড়লে তা বোঝা যায় না। ছেলেটির পক্ষে এই জীবনে তার স্বপ্নসঙ্গিনীর মায়া কাটানো সম্ভব না। সে বাকি জীবনে কখনো জুতো পায়ে ঘুমুবে না। সে আসলে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি চায় না। দুঃস্বপ্ন হলেও এটি সেইসঙ্গে তাঁর জীবনের মধুরতম স্বপ্ন।

আপনার কি ধারণা, নার্গিস নামের কোনো মেয়ে এই পৃথিবীতে সত্যি-সত্যি আছে?

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, আমি জানি না। রহস্যময় এই পৃথিবীর খুব কম রহস্যের সন্ধানই আমি জানি। তবে মাঝে-মাঝে আমার কেন জানি এই মেয়েটির হাত ধরে একবার দৌড়াতে ইচ্ছা করে- আরেক দফা চা হবে? পানি কি গরম করব?

99